অন্তরার বাবা

মফিজউদ্দিন সাহেব নির্বিরোধী মানুষ। প্রাইভেট ব্যাংকে ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগে কাজ করেন। ঢাকার মালিবাগে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকেন। চিপা গলির ভেতর ফ্ল্যাট। গাড়ি ঢোকে না বলে বেশ সস্তা। চার রুমের বাইশ শ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। ভাড়া তিন হাজার টাকা। মফিজউদ্দিন সাহেবের সংসার ছোট। স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। কানাডায় স্বামীর সঙ্গে থাকে। ছোট মেয়েটিরও বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্র পক্ষ মেয়ে দেখে গেছে। ফাইন্যাল কিছু না বললেও মেয়ে যে তাদের খুব পছন্দ এটা বোঝা যাচ্ছে। ছেলেটাও পড়াশোনায় ভালো। জুলাই মাসে অনার্স পরীক্ষা দেবে। পাস করে বের হয়ে কোথাও চাকরি না পেলে ব্যাংকে চাকরি হবেই। মফিজউদ্দিন সাহেব তাঁর ব্যাংকের এমডি সাহেবকে বলে রেখেছেন।

কাজেই মফিজউদ্দিন সাহেবকে মোটামুটি সফল এবং সুখী মানুষ বলা যেতে পারে। তাঁর স্ত্রী-ভাগ্যও ভালো। রেহানা অতি শান্ত স্বভাবের মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে তার যে ঝগড়াটগড়া হয় না তা না, মাঝেমধ্যে হয়। তবে তখনো মফিজ সাহেবের কী দরকার কী দরকার না তার দিকে কঠিন নজর থাকে।

ব্যাংক থেকে ফিরতে মফিজ সাহেবের রোজই সন্ধ্যা সাতটা-আটটা বেজে যায়। তিনি ফিরেই গরম পানি দিয়ে গোসল করেন। গোসল সেরেই খেতে বসেন। খাওয়া শেষ করে মিনিট দশেক চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন, তারপর এসে টিভির সামনে বসেন। নাটক থাকলে নাটক দেখেন। নাটক না থাকলে ভিসিপিতে হিন্দি ছবি দেখেন। পুরোনো ছবি দুবার-তিনবার করে দেখতেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তবে পুরোনো ছবি যেন তাঁকে দেখতে না হয় রেহানার সেদিকেও নজর আছে। বাসায় কেউ না থাকলে তিনি নিজেই ভিডিও ক্লাব থেকে ছবি নিয়ে আসেন। হিন্দি ছবি দেখার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই, তবু স্বামীকে খুশি করার জন্যে

তিনি বলেন—নাচ-গান আসলে আমাকে ডাক দিও তো। তোমার সঙ্গে বসে দেখব। মফিজ সাহেব সুবোধ স্বামীর মতো নাচ-গানের জায়গা এলে স্ত্রীকে ডাকেন।

স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক কথাবার্তা ছবি দেখার সময়ই হয়। কারণ মফিজ সাহেব ছবি শেষ করেই ঘুমাতে যান। তাঁকে খুব ভোরে উঠতে হয়। প্রাইভেট ব্যাংক, ন'টা থেকে ব্যাংকিং আওয়ার।

মফিজ সাহেবের জীবনযাত্রা এভাবেই চলছিল। এক বুধবারে সামান্য ব্যতিক্রম হল। তিনি পলিথিনের এক পোঁটলা নিয়ে অফিস থেকে ফিরে যথারীতি গোসল করতে গেলেন। গোসলের মাঝখানে রেহানা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, পোঁটলার ভেতর কাপড় কিসের?

মফিজ সাহেব বললেন, আমার কাপড়।

'তোমার কী কাপড়?'

'কিনলাম আর কি?'

'কিনবে তো বটেই। বিনা টাকায় তোমাকে কে কাপড় দিবে? কিসের কাপড়?'

'কাফনের কাপড়।'

'কাফনের কাপড় মানে কী?'

মফিজ সাহেব জবাব দিলেন না। মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। রেহানা বললেন, জবাব দিচ্ছ না কেন কাফনের কাপড় মানে কী? কার কাফনের কাপড়? তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি মারা গেছ নাকি যে তোমার কাফনের কাপড়? গোসলটা একটু বন্ধ রেখে কথার জবাব দাও তো।

'আমার এক কলিগ হজ করতে গিয়েছিলেন। তাকে আনতে বলেছিলাম।'

'মক্কা থেকে তোমার জন্যে কাফনের কাপড় আনতে বলেছ? কেন দেশে সাদা কাপড় পাওয়া যায় না?'

'কাবা শরিফ ছুঁয়ায়ে এনেছে।'

'কাবা শরিফ ছুঁয়ায়ে তোমার জন্যে কাফনের কাপড় আনতে হবে কেন?'

মফিজ সাহেব গোসল শেষ করে বের হলেন। শান্ত গলায় বললেন, ভাত দাও।

'ভাত দাও মানে? তুমি আগে বল কাফনের কাপড় কী মনে করে আনালে?'

মফিজ সাহেব জবাব দিলেন না। খাবার টেবিলের দিকে রওনা হলেন।

বিয়ের কথা ঠিকঠাক হবার পর কোন এক বিচিত্র কারণে মেয়েরা বাবার দিকে চলে আসে। অতিরিক্ত মমতা দেখায়। খানিকটা আহ্লাদীও করে। মফিজউদ্দিন সাহেবের মেয়ে অন্তরার ভেতরও এই ব্যাপার হয়েছে। সে তার ঘরে বসে ছিল। মায়ের চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত মুখে বলল, এ রকম করছ কেন মা?

রেহানা বললেন, কী করছি? তোর বাবা কী করেছে শুনতে পাস নি? কাফনের কাপড় নিয়ে এসেছে।

'কী হয়েছে তাতে? অনেকেই আনে। শুধু শুধু চেঁচিও না তো মা। একটা মানুষ সারা দিন অফিস করে এসেছে তাকে তুমি রেস্ট দেবে না? চিৎকার করে মাথার পোকা নড়িয়ে দিচ্ছ।'

'এই কাফনের কাপড় আমি কিন্তু ঘরে রাখব না।'

'আচ্ছা রেখো না। এখন দয়া করে চিৎকার থামাও। ভাত খাবার পর বাবা মুভি দেখবে—নতুন কিছু এনেছ? না আনলে স্লিপ দিয়ে কাজের মেয়েটাকে পাঠাও। বেচারা রোজ পুরোনো মুভি দেখে, আমার খুব খারাপ লাগে। মাদার ইন্ডিয়া ছবিটা এই নিয়ে তিনবার দেখল। তিনবার দেখার মতো কী আছে?'

অন্তরা তার বাবার খাবার সময়ও কিছুক্ষণ সামনে বসে রইল। প্লেটে ভাত তুলে দিল। মফিজউদ্দিন সাহেব নিঃশব্দে খেয়ে গেলেন। এমনিতেই তিনি কথা কম বলেন, খাবার সময় একেবারেই বলেন না।

মফিজউদ্দিন খেয়েদেয়ে অন্য দিনের মতো রেস্ট নিতে গেলেন না। সরাসরি ছবি দেখতে গেলেন। অন্তরা টেলিফোন নিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে রোজ রাত ন'টার সময় সে টেলিফোন করে। টেলিফোনে এক ঘণ্টার মতো কথা হয়। এক ঘণ্টা কথায় অনেক কিছু চলে আসে। অন্তরা তার বাবার কাফনের কাপড় কেনার প্রসঙ্গ নিয়ে এল—

'এই জান আজ কী হয়েছে? ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'আমার বাবা অর্থাৎ তোমার শ্বশুর সাহেব ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড করেছেন।'

'কী কাণ্ড!'

'আন্দাজ কর তো, দেখি পার কি না।'

'আন্দাজ করতে পারছি না। উনি কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছেন?'

'উনি বলছ কেন?'

'উনি বলব না তো কী বলব?'

'বাবা বলবে।'

'এখনই বাবা বলব নাকি?'

'হ্যাঁ এখনই বাবা বলবে। আমি তো তোমার মাকে এখনই মা বলি।'

'কবে মা বললে?'

'ওমা এর মধ্যে ভুলে গেছ! কাল আমি জিজ্ঞেস করলাম না, মা কেমন আছেন। আমি কি বলেছি তোমার মা কেমন আছেন?'

'ও আচ্ছা। এখন মনে পড়েছে।'

'তোমার এমন ভুলোমন, কোন দিন আমাকে ভুলে যাবে! কে জানে হয়তো এখনই ভুলে যাবে। বল তো আমার নাম কী?'

'আসলেই তো ভুলে গেছি— তোমার নাম যেন কী?'

'ফাজলামি করবে না তো।'

'আচ্ছা যাও ফাজলামি করব না। তোমাদের বাসায় ভয়ঙ্কর ব্যাপার কী হল তা কিন্তু এখনো বল নি।'

'আমার বাবা কাফনের কাপড় কিনে নিয়ে এসেছেন।'

'সে কী! কার জন্যে?'

'কার জন্যে আবার, নিজের জন্যে।'

'বল কী! মাথা খারাপ নাকি?'

'নিজের শ্বশুর সম্পর্কে এসব কী বলছ, ছিঃ!'

'আই অ্যাম সরি। তবে অন্তরা শোন কাফনের কাপড় কিন্তু অনেকেই কেনে। আমার এক দূরসম্পর্কের নানা কিনেছিলেন। শেষে দেখা গেল—তাঁর সংসারের সবাই মারা গেছে তিনি শুধু বেঁচে আছেন। তাঁর আর মৃত্যু হচ্ছে না।'

'আসলে বাবা হচ্ছেন খুবই স্ট্রেঞ্জ মানুষ। তিনি নিজের মতো থাকেন। অফিস করেন। কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো কমপ্লেইন নেই।'

'কাফনের কাপড় কিনে এনে কী বললেন?'

'কিছুই বলেন নি। তিনি নিজের মতো আছেন। এখন ছবি দেখছেন।'

'কার ছবি দেখছেন?'

'ভিসিআর-এ ছবি দেখছেন। বাবার এই একটা শখ—ছবি দেখা। এখন দেখছেন ঠাণ্ডি হাওয়া। তুমি ঠাণ্ডি হাওয়া দেখেছ?'

'না।'

'গানগুলি এত সুন্দর। শুনলে পাগল হয়ে যেতে হয়। আচ্ছা আমি তোমাকে ক্যাসেট পাঠিয়ে দেব।'

'পাঠিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।'

'খবরদার এই কাজ করবে না। বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়িতে ঘোরাঘুরি আমার খুব অপছন্দ।'

'অপছন্দ হলেও এই কাজটা আমাকে করতে হবে। রাজকন্যাকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না।'

'খবরদার ঢং করবে না। আচ্ছা তুমি এত ঢং কোথায় শিখেছ?'

'আমার ইচ্ছা করছে এখনই চলে আসি। আমি গোপনে এসে চুপ করে তোমার দরজায় টোকা দেব। তুমি দরজা খুলতেই ঝপাং।'

'ঝপাং মানে?'

'ঝপাং করে তোমার গায়ে লাফিয়ে পড়ব।'

'এই শোন তুমি কিন্তু কথাবার্তা—অসভ্য দিকে নিয়ে যাচ্ছ। এ রকম করলে আমি কিন্তু টেলিফোন রেখে দেব।'

'উঁহুঁ রাখতে পারবে না। কারণ আমাদের কথা হয়েছিল আমি একটা অসভ্য কথা বলতে পারি।'

'একটা বলে ফেলেছ আর পারবে না।'

'এখনো বলি নি।'

'আমি কিন্তু টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। এই রাখলাম, ওয়ান, টু, থ্রি।'

অন্তরা টেলিফোন নামিয়ে রিংগার অফ করে দিল। ওপাশ থেকে টেলিফোন করে করে ক্লান্ত হোক। মজা বুঝুক। রাত বারটার পর অন্তরা নিজেই করবে। এর মধ্যে অসভ্য কথা বলার জন্যে বাবু সাহেবের যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাবে।

অন্তরা মাকে নিয়ে খেতে বসল। সাজ্জাদ বাসায় নেই। সে তার বন্ধুর বাড়িতে পড়াশোনা করতে গিয়েছে। পড়াশোনা শেষ করে রাতে সেখানেই থেকে যাবে। অন্তরা বলল, কাজের মেয়েটাকে বল তো মা বাবাকে এক কাপ চা দিয়ে আসুক। ছবি দেখার সময় চা খেতে ভালো লাগে।

রেহানা বললেন, তোর বাবার চা-কফি কিছুই লাগে না। কাপে করে গরম পানি দিয়ে আয়। চুকচুক করে গরম পানি খাবে আর ছবি দেখবে। ছবিও কিন্তু দেখে না। ঘটনা কী জিজ্ঞেস কর, বলতে পারবে না।

'কী যে তুমি বল! কেন বলতে পারবে না?'

'তাকিয়ে থাকার জন্যে তাকিয়ে থাকা।'

'তুমি বাবার ওপর রেগে আছ বলে এরকম কথা বলছ।'

'রাগের মতো কাজ করলে আমি রাগব না!'

'বাবা মোটেই রাগের মতো কাণ্ড করে নি। কাফনের কাপড় অনেকেই কেনে। আমার এক খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের নানা কিনেছিলেন। তার পর কী হয়েছে শোন মা। তাঁর সংসারের সবাই একে একে মরে গেলেন। তিনি শুধু বেঁচে রইলেন। অমর হয়ে গেলেন। বাবার বেলাতেও বোধহয় এরকম হবে। দেখা যাবে বাবা বেঁচে আছেন। আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে গেছি। হি-হি-হি।'

রেহানা মুখ কালো করে বললেন, হাসছিস কেন? হাসির কী হল?

'হাসি আসছে আমি করব কী? মাগো কী অদ্ভুত দৃশ্য বাবা কাফনের কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে বিভিন্ন গাছে বাস করছি। হি-হি-হি।'

'হাসি বন্ধ কর। বন্ধ কর বললাম।'

অন্তরা হাসি বন্ধ করতে পারল না। হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলল, মা, ভূত হয়ে আমি কিন্তু বগনভিলিয়া গাছটায় থাকব তুমি অন্য কোনো গাছ বেছে নাও। হি-হি-হি।

অন্তরার ইচ্ছা করছে ভূতবিষয়ক এই মজার ব্যাপারটা এক্ষুনি টেলিফোন করে আসল মানুষটাকে জানায়। তবে ইচ্ছা করলেও এই কাজটা সে এখন করবে না। রাত বারটার আগে অবশ্যই না। রাত বারটা পর্যন্ত বাবু সাহেব টেলিফোনে আঙুল টিপে টিপে ক্লান্ত হয়ে নিক। অসভ্য কথা বলার মজাটা টের পাক।

রেহানা ঘরের কাজ শেষ করে ঘুমাতে যাবার আগে ঘড়ির দিকে তাকালেন, দশটা বেজে এগার মিনিট। অন্তরার বাবা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক দশটায় সে দাঁত মেজে বিছানায় যায়। তার বিছানায় যাওয়া মানেই ঘুম। তখন ডাকলে 'উ' করে সাড়া দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই সাড়া দেয়াটাও হয় ঘুমের মধ্যে। আশ্চর্য একটা মানুষ। সংসারে কী হচ্ছে কী না হচ্ছে কোনো খোঁজ নেই। ছেলেটা আজ বাসায় নেই এটাও তাঁর চোখে পড়ল না। চোখে পড়লেও অবিশ্যি কিছু হবে না। জিজ্ঞেস করবে না, সে কোথায়। বাসায় একটা বিয়ে হচ্ছে। জিনিসপত্র কেনাকাটা আছে। বিয়ের তারিখ ঠিক করা আছে—কোনোটার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। সে আছে নিজের মতো, মাস শেষে বেতনের টাকাটা তুলে দিলেই যেন সব দায়িত্ব শেষ। এরকম মানুষের আসলে সংসার করাই ঠিক না। এরা আসলে মানুষও না। ঘরের আসবাব। সংসারে এদের ভূমিকা ফার্নিচারের মতো। জায়গামতো ফার্নিচারটা বসিয়ে দাও। মাঝেমধ্যে ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ধুলা উড়িয়ে দাও—সব ঠিক।

রেহানা পান মুখে দিয়ে অন্তরার ঘরের দিকে গেলেন। তাঁরও কথা বলার মানুষ নেই। মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা। সেই সুযোগও বেশি দিন পাওয়া যাচ্ছে না। বিয়ে হয়ে মেয়ে চলে যাচ্ছে।

রেহানা অন্তরার ঘরে ঢুকতেই অন্তরা বলল, মা আজ তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব না। আজ যাও তো।

'কী করবি? টেলিফোন নিয়ে বসবি?'

'টেলিফোন নিয়ে বসব মানে, আমি কি সারাক্ষণ টেলিফোন নিয়ে থাকি?'

'যখনই তোর ঘরের সামনে দিয়ে যাই তখনই দেখি গুটুরগুটুর করছিস। বিয়ের আগে এত কথা বলে ফেললে বিয়ের পর কী বলবি?'

'আশ্চর্য কথা! তোমার ধারণা দেখে অবাক হচ্ছি মা। তুমি ভাবছ আমি ওর সঙ্গে কথা বলি? আমার এত কী দায় পড়েছে? আজ সে টেলিফোন করেছিল। আমি মুখের ওপর টেলিফোন রেখে দিয়ে রিংগার অফ করে দিয়েছি যাতে টেলিফোন করলেও আমাকে ধরতে না হয়।'

'সে কী! কেন?'

'আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না এই জন্যে।'

'এটা তো ঠিক না, মুখের ওপর টেলিফোন রেখে দিবি কেন?'

'কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না তা নিয়ে তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে না মা। প্লিজ তুমি এখন যাও। তোমাকে অসহ্য লাগছে।'

'কেন, আমি কী করলাম?'

'তুমি কী করলে আমি জানি না। আমি শুধু জানি—এ বাড়ির সবাইকে আমার অসহ্য লাগছে।'

রেহানা মুখ কালো করে মেয়ের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। নিজের শোবার ঘরে ঢুকে চমকে গেলেন। কারণ, অন্তরার বাবা এখনো জেগে আছে। তারচেয়ে বড় কথা তাঁর সামনে কাফনের কাপড় বিছানো। কাপড়টা প্যাকেট থেকে বের করা হয়েছে। রেহানা বললেন, জেগে আছ কেন?

মফিজউদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন, ঘুম আসছে না।

'সামনে কাপড় নিয়ে বসে আছ কেন?'

'মেপে দেখলাম। মনে হচ্ছে কাপড় একটু শর্ট পড়বে।'

'মাপলে কীভাবে? বাজার থেকে গজফিতাও নিয়ে এসেছ?'

'হাত দিয়ে মাপলাম। তিন হাত হচ্ছে এক গজ।'

রেহানা স্বামীর সামনে বসতে বসতে বললেন, তোমার কী হয়েছে ঠিকমতো বল তো।

'কিছু হয় নাই।'

'অবশ্যই হয়েছে। তোমার চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। কাফনের কাপড় কেন কিনলে বল?'

'কাজ আগিয়ে রাখলাম। যেদিন মারা যাব সেদিন যদি হরতাল থাকে দোকানপাট থাকবে বন্ধ।'

'কবরের গর্তও খুঁড়িয়ে রাখ। হরতালের দিন কবর খোদার লোক যদি না পাওয়া যায়!'

মফিজউদ্দিন কিছু বললেন না। রেহানা বললেন, আস ঘুমাতে আস। আর খবরদার তুমি এই কাপড়ে হাত দেবে না।

'আচ্ছা।'

'এই কাপড়ের প্রসঙ্গ মুখেও আনবে না।'

'আচ্ছা।'

রেহানা স্বামীকে নিয়ে ঘুমাতে গেলেন। ইচ্ছা করে আজ ঘনিষ্ঠ হলেন। স্বামীর গায়ে হাত রেখে আদুরে গলায় বললেন—এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ এরকম তো কখনো হয় না। বিশেষ কিছুর প্রয়োজন থাকলে বল। লজ্জা করার দরকার নেই। কিছু লাগবে?

'না।'

'আচ্ছা বেশ ঘুমাবার আগে পাঁচ–দশ মিনিট গল্প কর। নাকি তাও করবে না?'

'কী গল্প?'

'যা ইচ্ছা বল। আজকে যে ছবিটা দেখলে সেই গল্প বলতে পার। অফিসের গল্প বলতে পার। তোমাদের অফিসে মজার কিছু হয় না?'

'না।'

'কোনো গল্প করতে ইচ্ছা করছে না?'

মফিজউদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন, একটা গল্প করতে ইচ্ছা করছে কিন্তু তুমি রাগ করবে।

'না রাগ করব না, বল।'

'কাফনের কাপড় নিয়ে গল্প। পুরুষদের কাফনের কাপড় লাগে তিনটা। এদের আলাদা আলাদা নাম আছে। একটা হল পিরহান। ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। আরেকটাকে বলে ইজার। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইজার দিয়ে ঢাকা হয়। আরেকটাকে বলে লেফাফা। এটা ইজারের মতোই। শুনছ?'

'হ্যাঁ শুনছি।'

'মেয়েদের কাপড় লাগে পাঁচটা। পিরহান, ইজার, লেফাফা তো আছেই, তার ওপর বাড়তি হল—ছের বন্দ। ছের বন্দ দিয়ে মাথার চুল জড়িয়ে দিতে হয়। আর হল সিনা বন্দ। সিনা বন্দ দিয়ে বুক থেকে উরু পর্যন্ত ঢাকা হয়।'

রেহানা থমথমে গলায় বললেন, আরো কিছু বলবে? মফিজউদ্দিন বললেন, কাফনের কাপড়ের আরেকটা মজার ব্যাপার আছে। হিজড়াদের মেয়েদের মতো কাফনের কাপড় পরাতে হয়। ওদেরও পাঁচ টুকরা কাপড় লাগে।

'ও।'

'আর পুরুষত্ব নেই পুরুষ, যারা নপুংসক তাদের জন্যেও পাঁচটা কাপড় লাগে।'

'যথেষ্ট কথা বলেছ। আর না এখন ঘুমাতে যাও।'

'ঘুম আসছে না।'

'ঘুম না আসলে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি কর। কিংবা ছবি দেখ। অন্তরাকে বল ভিসিআর ছেড়ে দেবে।'

'ভিসিআর আমি নিজেই ছাড়তে পারি।'

'তা হলে তো ভালোই।'

মফিজউদ্দিন বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। রেহানাও নামলেন—তাঁর মাথা চড়ে গেছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হবে। ঘুমের ওষুধ খেলেও হয়তো ঘুম হবে না।

রাত বারটা বাজে। অন্তরা টেলিফোন করল। একটা রিং হতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল। অন্তরা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

'ঘুমাব মানে? তুমি এমন খট করে টেলিফোন রেখে দিলে।'

'তুমি অসভ্য কথা বলবে আর আমি টেলিফোন ধরে থাকব। আমি এরকম মেয়েই না। এই শোন আমার না মনটা খুব খারাপ।'

'কেন?'

'মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি এই জন্যে মন খারাপ।'

'খারাপ ব্যবহার করেছ কেন? উনি কী করেছিলেন?'

'আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিল।'

'গল্প করতে এলে খারাপ ব্যবহার করবে কেন?'

'মাকে তো তুমি চেন না। মা বিরাট গল্পবাজ। একবার গল্প শুরু করলে আর থামবে না। গল্প করেই যাবে।'

'তাতে অসুবিধা কী? তুমি গল্প করতে।'

'মার সঙ্গে গল্প করলে আমি তোমার সঙ্গে কখন গল্প করব? এখন একটা কথা আমার বলতে ইচ্ছা করছে কিন্তু বললে তুমি মাথায় উঠে যাবে। এই জন্যে বলব না।'

'প্লিজ বল।'

'কথাটা হচ্ছে—তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'মিথ্যা কথা।'

অন্তরা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না?

ওপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বলা হল, বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করব না কেন?

'তা হলে কেন বললে—মিথ্যা কথা।'

'এমনি বললাম, মজা করার জন্যে বললাম।'

'খবরদার আর বলবে না।'

'আচ্ছা যাও আর বলব না।'

'প্রমিজ!'

'প্রমিজ।'

'একটু ধর তো এক মিনিট।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বসার ঘরে ভিসিআর চলছে। দেখে আসি কী ব্যাপার।'

'এত রাতে কে ছবি দেখছে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না, তুমি ধর তো।'

অন্তরা বসার ঘরে ঢুকল। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। মফিজউদ্দিন সাহেব ভিসিআর দেখছেন। তাঁর গায়ে কাফনের কাপড়। তিনি শুয়ে আছেন লম্বা হয়ে। মাথার নিচে বালিশ দেয়া যাতে ভিসিআর দেখতে অসুবিধা না হয়। অন্তরা কাঁপা গলায় ডাকল, বাবা!

মফিজউদ্দিন মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়েই টিভি পরদার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

অন্তরা বলল, তুমি কী পরে আছ বাবা?

মফিজউদ্দিন টিভি পরদা থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন—কাপড়টা পরে দেখলাম ফিটিং হয় কি না। ভালো ফিটিং হয়েছে।

অন্তরা সারা বাড়ি কাঁপিয়ে বিকট চিৎকার দিল। গলা ফাটিয়ে ডাকল, মা...মা...।

মফিজউদ্দিন সাহেবের তাতে কোনো ভাবান্তর হল না।

কাফনে মোড়া একজন মানুষ, শুধু মুখটা বের হয়ে আছে। চোখ খোলা। সেই চোখ তাকিয়ে আছে টিভি পরদার দিকে। টিভি পরদার আলো এসে চোখে পড়েছে। তাঁর চোখ চকচক করছে।

লিপি

'জাংক মেইল' বলে একটা ব্যাপার আছে যা চরিত্রগত দিক দিয়ে ১০০ ভাগ আমেরিকান। একমাত্র আমেরিকাতেই মেইল বক্স খুললে হাতভরতি চিঠিপত্র পাওয়া যায়। যার ভেতর একটা বা দুটা কাজের চিঠি, বাকি সবই অকাজের বা আমেরিকান ভাষায়—জাংক মেইল।

জাংক চিঠিগুলি চট করে আলাদা করাও মুশকিল। খাম দেখে মনে হবে খুব জরুরি কিছু চিঠি। চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়লে ভুল ভাঙবে। একটা নমুনা দেই—

প্রিয় হুমায়ূন,

তুমি কি জান তুমি একজন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি? টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে এক মিলিয়ন র‍্যানডম নাম্বার নিয়ে একটি সুইপস্টেক করা হয়েছে। যার বিশ জন ফাইন্যালিস্টের মধ্যে তুমি এক জন। প্রথম পুরস্কার এক সপ্তাহ বিশ্বভ্রমণের জন্য ২টি প্রথম শ্রেণীর বিমানের টিকিট। দ্বিতীয় পুরস্কার চার দিনের জন্য ফ্লোরিডা প্যাকেজ।

আমাদের নিয়মানুসারে বিশ জন ফাইন্যালিস্টকে আমাদের কোম্পানির একটি করে প্রোডাক্ট কিনতে হবে। আমরা ক্যাটালগ পাঠালাম। তুমি কোনটি কিনতে চাও তাতে টিক মার্ক দিয়ে সেই পরিমাণ ডলার আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

আশা করি তুমি এই সুযোগ হারাবে না। তোমাকে সুইপস্টেকের ফাইন্যালিস্টদের এক জন হবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

....

জাংক মেইলগুলির প্রথম লাইন পড়ে ফেলে দেয়াই নিয়ম। আমি তা করি না। কেন জানি খুব আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়ি। যা বলে তা বিশ্বাসও করি। আমেরিকানরা চিঠি লিখে মিথ্যা কথা বলবে এটা ভাবতেও আমার কাছে খারাপ লাগে।

এই গল্পটি জাকে মেইল নিয়ে। প্রস্তাবনা অংশ শেষ হয়েছে, এখন মূল গল্পে আসি।

১৯৮০ সনের জুন-জুলাই মাসের ঘটনা। আমি তখন নর্থডেকোটায়। স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি। হঠাৎ একদিন মেইল বক্সে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা এ রকম—

ড. আহমেদ,

আমি জেনেছি তুমি লুপ্ত প্রাচীন ভাষার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। আমার কাছে লুপ্ত ভাষায় লেখা একটি কাগজ আছে। তুমি যদি ভাষার পাঠোদ্ধারে আমাকে সাহায্য কর আমি খুশি হব। তুমি দয়া করে নিম্নলিখিত পোষ্ট বক্স নাম্বারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কর। ভালো কথা, তোমার পরিশ্রমের জন্য যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে।

....

বলাই বাহুল্য, এটা একটা জাকে চিঠি। পোষ্ট বক্সের ঠিকানায় উত্তর দিলেই ধরা খেতে হবে। প্রাচীন ভাষাবিষয়ক কোনো সোসাইটির সদস্য হতে হবে যার জন্য মাসিক চাঁদা বিশ ডলার বা এই জাতীয় কিছু। চিঠি আমি ফেলেই দিতাম কিন্তু আমার নামের আগে ড. পদবিটি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিল। তখনো ডক্টর ডিগ্রি পাই নি। পাব পাব ভাব। কিউমিলিটিভ একজাম পাস করেছি। থিসিস লিখছি। এই সময় কেউ যদি ড. লিখে চিঠি পাঠায় মন দুর্বল হতে বাধ্য। কাজেই আমি চিঠির জবাব পাঠালাম। আমি লিখলাম—

জনাব,

আপনার চিঠি পেয়েছি। প্রাচীন লুপ্ত ভাষা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমার পড়াশোনার বিষয় পলিমার রসায়ন। আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমি প্রাচীন ভাষা জানি এই তথ্য কোথায় পেলেন জানালে খুশি হব।

বিনীত

হুমায়ূন আহমেদ

পুনশ্চ ১ : আমি এখনো Ph. D. ডিগ্রি পাই নি। আপনার এই তথ্যটিও ভুল।

পুনশ্চ ২ : আপনার চিঠিটি যদি জাকে মেইল জাতীয় হয় তা হলে জবাব দিবেন না।

আমি এই চিঠির জবাব আশা করি নি। কিন্তু সাত দিনের মাথায় জবাব পেলাম। জবাবটা হুবহু তুলে দিলাম—

প্রিয় আহমেদ,

আমার চিঠিটি জাংক মেইল নয়। সে কারণেই জবাব দিচ্ছি। তুমি প্রাচীন লুপ্ত ভাষা নিয়ে গবেষণা কর এই তথ্য তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আমাকে জানিয়েছে।

আমি আমেরিকার প্রায় সব বড় লাইব্রেরিকে একটি আবেদন পাঠিয়েছিলাম। সেখানে জানতে চেয়েছি লাইব্রেরির পাঠকদের মাঝে এমন কেউ কি আছেন যারা প্রাচীন ভাষা নিয়ে পড়াশোনা বা গবেষণা করেন?

তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি তোমার নাম পাঠিয়েছে এবং তোমার নামের আগে ড. পদবি তারাই দিয়ে দিয়েছে।

তুমি লিখেছ তোমার বিষয় পলিমার রসায়ন। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে পলিমার রসায়ন তোমার বিষয় হলেও তুমি লুপ্ত প্রাচীন ভাষা বিষয়ে আগ্রহী। তা না হলে তুমি আমার চিঠির জবাব দিতে না। তুমি কি দয়া করে একটি প্রাচীন ভাষা উদ্ধারে আমাকে সাহায্য করবে? লিপিটির পাঠোদ্ধার করা আমার খুবই প্রয়োজন।

বিনীত
এরিখ স্যামসন
সিনোসিটা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি আমার নাম কেন পাঠিয়েছে ভেবে বের করতে গিয়ে মনে পড়ল—গত সামারে লাইব্রেরি থেকে রোসেটা স্টোনের উপর একটি বই আমি ইস্যু করেছিলাম।

প্রাচীন মিশরীয় হিরোগ্লোফির পাঠোদ্ধারে রোসেটা স্টোন বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। ঘটনাটা কী জানার জন্য বইটি পড়া। বইটি পড়ে আরেকটি বই ইস্যু করি 'অশোকের শিলালিপি'। 'অশোকের শিলালিপি' অনেক দিন ধরে পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছিল না—এক ইংরেজ সাহেব শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই দুটি বই পড়ার পর আমি মায়াদের ভাষা পাঠোদ্ধারের চেষ্টাবিষয়ক আরেকটি বই ইস্যু করি। এই থেকেই কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের ধারণা হয়েছে আমি প্রাচীন ভাষার একজন গবেষক?

আমি যদি প্রাচীন ভাষার গবেষক হইও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আমার অনুমতি ছাড়া আমার নাম-ঠিকানা কাউকে দিতে পারে না। এইসব বিষয়ে আমেরিকায় নিয়মকানুন খুব কঠিন। আমি ঠিক করলাম লাইব্রেরিয়ানকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করব।

জিজ্ঞেস করা হল না। কারণ আমি তখন খুবই ব্যস্ত। মানুষ তার এক জীবনে নানান ধরনের ব্যস্ততায় জড়িয়ে যায়। পিএইচ.ডি. থিসিস প্রস্তুতকালীন ব্যস্ততার সঙ্গে

অন্য কোনো ব্যস্ততার তুলনা চলে বলে আমি মনে করি না। একটা চ্যাপ্টার লিখে প্রফেসরকে দেখাই, তিনি পুরোটা কেটে দেন। আবার লিখে নিয়ে যাই, আবারো কেটে দেন। আমি ল্যাবরেটরি রেজাল্টের যে ব্যাখ্যা দেই সেগুলি তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি যেসব ব্যাখ্যা দেন তা আমার পছন্দ হয় না। চলতে থাকে ধারাবাহিক কাটাকুটি খেলা।

মাঝে মাঝে রাগারাগিও হয়। যেমন, একদিন আমার প্রফেসর বললেন—'আহমেদ, তোমাকে তো বেশ বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবেই জানতাম। এখন তোমার থিসিস পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে তোমার আই কিউ এবং মিডিয়াম সাইজের কড মাছের আই কিউ কাছাকাছি। মাছেরটা বরং কিছু বেশি হতে পারে।'

প্রফেসরের এই ধরনের কথাবার্তায় খুবই মন খারাপ হয়। এপার্টমেন্টে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি। ভাত না খেয়ে থালা-বাসন ছুড়ে মারি। থিসিস লেখার সময় পিএইচ.ডি. স্টুডেন্টদের এই আচরণ খুবই স্বাভাবিক। আমেরিকার ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকসের এই বিষয়ে একটি স্ট্যাটিসটিকসও আছে। তারা দেখিয়েছে—বিবাহিত ছাত্রদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার পিএইচ.ডি. করার সময়ে সবচে বেশি—শতকরা ৫৩। এই ৫৩-এর ভেতর ৯৭% বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যখন ছাত্ররা তাদের থিসিস লেখা শুরু করে।

প্রতিদিন যে হারে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে তাতে মনে হয় আমি ওই স্টেজে দ্রুত চলে এসেছি। একদিন ঝগড়া চরমে উঠল—আমার কন্যার মাতা আমাকে হতভম্ব করে কন্যার হাত ধরে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হল। সে নাকি নিউইয়র্কের দুটো টিকিট কাটিয়ে রেখেছে। আসছে দু মাস সে নিউইয়র্কে তার মামার কাছে থাকবে। আমার থিসিস লেখা শেষ হবার পর ফিরবে। যদি কোনো কারণে থিসিস লেখা শেষ না হয় তা হলে আর ফিরবে না।

আমি রাগ দেখিয়ে বললাম, খুবই ভালো কথা। তোমাদের আরো আগেই যাওয়া উচিত ছিল। হু কেয়ারস? গো টু হেল।

'গো টু হেল' গালিটা তখন নতুন শিখেছি। যখন-তখন ব্যবহার করি এবং অত্যন্ত ভালো লাগে। বাংলা ভাষায় 'জাহান্নামে যাও'-এর চেয়েও লাগসই মনে হয়।

ব্যাচেলার জীবন হচ্ছে সর্বোত্তম। এই জীবনে আছে মুক্তির আনন্দ—এ ধরনের অতি উচ্চ ভাব নিয়ে প্রথম রাতটা কাটল। দ্বিতীয় রাত আর কাটতে চায় না। আমি সময় কাটাবার জন্য রাত এগারটায় এরিখ স্যামসনকে টেলিফোন করলাম।

'হ্যালো এরিখ।'

'ইয়েস। মে আই নো, হু ইজ স্পিকিং?'

আমি নাম বললাম। আমার মনে হল অপর প্রান্তে এরিখ আনন্দের আতিশয্যে শূন্যে লাফ দিল। যেন দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়েছে। উচ্ছ্বাস বাঁধ মানছে না। আমেরিকানদের এ ধরনের উচ্ছ্বাসের সবটাই সাধারণত মেকি হয়ে থাকে।

আমার মতো বোকা বিদেশীরা এতে বিভ্রান্ত হয়। যাই হোক আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যা হল তা মোটামুটি এরকম—

'আহমেদ তুমি কেমন আছ?'

'খুবই ভালো আছি। তবে এই মুহূর্তে মনটা একটু খারাপ।'

'কেন জানতে পারি কি? যদি কোনো অসুবিধা না থাকে।'

'কোনো অসুবিধা নেই। রাগ করে আমার স্ত্রী নিউইয়র্কে চলে গেছে। যাবার আগে জানিয়েছে দু মাসের ভেতর সে ফিরবে না।'

'তুমি নিশ্চিত থাক দিন তিনেকের ভেতরই তোমার স্ত্রী ফিরে আসবে। মন খারাপের কারণেই তুমি আমাকে টেলিফোন করেছ নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?'

'তোমার প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের কিছু হয়েছে কি না জানার আগ্রহ হচ্ছে।'

'এখনো কিছু হয় নি।'

'চেষ্টা নিশ্চয়ই চালিয়ে যাচ্ছ?'

'সাঙ্কেতিক কোড ভাঙতে পারে এমন একটা সফটওয়্যারের সন্ধান পেয়েছি। দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে কিনতে পারছি না। তবে মনে হয় কিনে ফেলব। তোমার কি ধারণা কেনা উচিত?'

'তুমি যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হও যে সফটওয়্যার তোমার লিপির পাঠোদ্ধার করবে তা হলে কিনে ফেল। আর যদি সন্দেহ থাকে তা হলে কেনা ঠিক হবে না। কারণ এই সফটওয়্যারের তখন আর কোনো উপযোগিতা নেই।'

'আমিও তাই ভাবছি। তোমাকে তোমার মূল্যবান মতামতের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

এই পর্যন্ত কথাবার্তার পর আমি টেলিফোন রেখে ঘুমাতে গেলাম। তার পাঁচ মিনিটের মাথায় এরিখের টেলিফোন পেলাম।

'হ্যালো আহমেদ।'

'হ্যাঁ বল।'

'তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি বলে দুঃখিত। কথাটা হচ্ছে আমি সিয়াটলে যাব। ফার্গো সিটি পার হয়ে যেতে হবে। তোমার হাতে যদি অবসর থাকে তা হলে ভাবছি এক রাত থাকব ফার্গো সিটিতে। তোমার সঙ্গে গল্প করা হবে এবং তুমি প্রাচীন লিপিটা ইচ্ছা করলে দেখতেও পার।'

আমি বললাম, প্রাচীন লিপি দেখার জন্য আমি ছটফট করছি।

কথাটা আমেরিকানদের মতো বললাম। আমেরিকানরা অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানোটা ভদ্রতার অংশ বলে মনে করে। কোনো আমেরিকান মা যদি বলে আমার বাচ্চাটা এবারে ভালো গ্রেড পেয়েছে তখন যাকে এই কথাটা বলা হবে তার দায়িত্ব হবে বিকট চিৎকার দিয়ে বলা—"ওয়াণ্ডারফুল। হোয়াট এ গ্রেট নিউজ!"

সত্যি কথাটা হল প্রাচীন লিপি বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই। আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্রাচীন লিপি পাওয়া যায় নি যেখানে রাজাদের যুদ্ধজয়ের কাহিনী এবং পুরোহিতদের মন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু লেখা। রাজাবাদশা এবং পুরোহিতদের বিষয়ে আগ্রহী হবার কোনো কারণ থাকার কথা না।

এরিখ স্যামসনের সঙ্গে ফার্গো হোটেলে দেখা হল। তার গলার স্বর শুনে মনে হয়েছিল যুবক মানুষ। এখন দেখি প্রৌঢ়। আমেরিকান প্রৌঢ়দের বয়স বোঝা মুশকিল, ৫০ থেকে ৭০ হতে পারে। বেশিও হতে পারে।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমেরিকান কায়দায় অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। গিফট র‍্যাপে মুড়ে সে আমার জন্য একটা গিফটও নিয়ে এসেছে। আমি সেই গিফট নিলাম। চামড়ায় বাঁধানো ডায়েরি। আমি সেই গিফট হাতে নিয়ে আমেরিকান কায়দায় অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম। এ রকম একটা ডায়েরি আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম। কয়েকবার দোকানে দেখেছি—কিন্তু কেন জানি শেষ পর্যন্ত কেনা হয় নি। এ ধরনের রুটিন কথাবার্তা বললাম।

আমার অতিথি সেই হিসেবে আমি তাকে রাতে আমার এপার্টমেন্টে খেতে নিয়ে গেলাম। এবং বললাম—তুমি খাওয়াদাওয়া কর। তারপর আমরা গল্পগুজব করব। সবচে ভালো হয় রাতে তুমি যদি হোটেলে ফিরে না যাও। আমার এপার্টমেন্ট পুরো খালি। তুমি রাতে থেকে যাবে। প্রয়োজনে সারারাত আমরা গল্প করতে পারব।

বাঙালিরা হোটেল পছন্দ করে না—তারা যেখানেই যায় বন্ধুবান্ধব খুঁজে বেড়ায়, বন্ধুবান্ধব না পেলে দেশের মানুষ খোঁজে। হোটেল খোঁজে না। আমেরিকানদের স্বভাব উল্টো, তারা প্রথমেই খোঁজে হোটেল। তারপরেও এরিখ স্যামসন আমার ঘরে থাকতে রাজি হয়ে গেল। আমার রাঁধা অখাদ্য ডাল-ভাত এবং ডিম ভাজা তৃপ্তি করে খেল। ডাল খেয়ে বলল, এত চমৎকার স্যুপ সে অনেকদিন খায় নি। তাকে যেন এই স্যুপের রেসিপি দেয়া হয়।

খাওয়া শেষ করে আমরা গল্প করতে গেলাম। কথক এরিখ স্যামসন, আমি শ্রোতা। আমেরিকানরা গল্প ভালো বলতে পারে না। কিন্তু এরিখ দেখলাম ভালোই গল্প করে। সাউথের উচ্চারণে তার ইংরেজি বুঝতে মাঝে মাঝে সমস্যা হচ্ছে। আমাকে প্রায়ই বলতে হচ্ছে—please say it again. তারপরেও বলতে বাধ্য হচ্ছি—কোনো আমেরিকানের মধ্যে আমি গল্প বলার এমন স্টাইল দেখি নি।

"আহমেদ, তোমাদের পূর্বদেশীয় ভদ্রতার কথা আমি বইপত্রে পড়েছি। বাস্তবে দেখার সুযোগ আগে হয় নি। আজ দেখলাম। তুমি আমার জন্য রান্নাবান্না করেছ। হোটেল থেকে আমাকে নিয়ে এসেছ এবং তোমার এপার্টমেন্টে আমাকে রাতে থাকতে বলছ—আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এ ধরনের আদরে

আমরা আমেরিকানরা অভ্যস্ত না। আমার খানিকটা অস্বস্তি অবিশ্যি লাগছে। কিন্তু ভালো লাগছে অনেক বেশি। যাই হোক আমি প্রাচীন লিপিবিষয়ক গল্পটা এখন তোমাকে বলব। এবং মূল লিপিটা তোমাকে দেখাব। এই লিপি বিষয়ে আমার এত আগ্রহ কেন তা গল্পটা শুনলেই তুমি ধরতে পারবে। এই গল্পের প্রায় সবটা জুড়েই আছে আমার স্ত্রী কেরোলিন। কাজেই এখন আমি যা করব তা হল কেরোলিনের গল্প বলব।

পৃথিবীর সব দেশেই বন্ধুবান্ধবের কাছে স্ত্রীর গল্প করা অরুচির পর্যায়ে পড়ে। তারপরেও বাধ্য হয়ে আমাকে তার গল্প করতে হচ্ছে।

আমি কেরোলিনকে বিয়ে করি যখন আমার বয়স মাত্র তেইশ। আমেরিকান পুরুষরা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ বিয়ে করে খুব অল্প বয়সে—আর এক ভাগ বিয়ে করে মধ্যবয়স পার করে। আমি প্রথম দলের।

কেরোলিন ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে পড়ত। আমরা ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরা তাকে খুব ভয়ের চোখে দেখতাম। কারণ, সে ছিল ভয়াবহ ধরনের ভালো ছাত্রী। শুধু আমরা ছাত্রছাত্রীরা না, শিক্ষকরাও তাকে খুব সমীহের চোখে দেখতেন। অথচ সে ছিল খুবই বিনয়ী। ক্লাসে এসে শেষের সারির চেয়ারের একটিতে মাথা নিচু করে বসে থাকত। শিক্ষকরা কোনো প্রশ্ন করলে সে কখনো জবাব দেবার জন্য হাত তুলত না। তাকেও শিক্ষকরা কখনো প্রশ্ন করতেন না, কারণ তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, এমন কোনো প্রশ্ন তাকে করা যাবে না যার উত্তর তার জানা নেই।

এ ধরনের মেয়েদের সঙ্গে আগবাড়িয়ে কেউ কথা বলে না। তাদের সঙ্গে ডেট করা তো অকল্পনীয় ব্যাপার। কেরোলিনের প্রসঙ্গে অনেক রসিকতাও আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন একবার নাকি বাজি ধরে কোন এক সিনিয়র ছাত্র কেরোলিনকে ডেট-এ নিয়ে গিয়েছিল। চাইনিজ ডিনার। ডিনার শেষে স্পিলবার্গের ছবি। কেরোলিন নাকি পুরো সময়টায় তার ডেটকে শুধু ফিজিক্সের প্রশ্ন করেছে। ডেট একবার শুধু বলেছে—কেরোলিন তোমার চোখ তো খুব সুন্দর। কালো চোখ।

তার উত্তরে কেরোলিন বলেছে—চোখের কালোটা হয় টিনডেল এফেক্টের জন্যে। তারপরই টিনডেল এফেক্ট এবং টিনডেল ফেনোমেনার ওপর তিন মিনিট বক্তৃতা দিয়েছে।

ডেটের শেষে ছেলেটা বাড়িতে ফিরেছে জ্বর এবং প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে।

কেরোলিনকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। আমেরিকান সোসাইটি অতি স্মার্ট তরুণী পছন্দ করে না। স্মার্ট শব্দটি আমি মেধা অর্থে ব্যবহার করছি।

যাই হোক, একদিন কী হয়েছে বলি। টার্ম পেপার জমা দিতে হবে—আমি পেপার লেখার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়েছি। হঠাৎ দেখি লাইব্রেরির এক কোনায় কেরোলিন মাথা নিচু করে বসে আছে। তার সামনে বেশ কিছু বই। একটা পেপার কাপে কফি। ন্যাপকিনের উপর একটা স্যান্ডউইচ রাখা। স্যান্ডউইচের পাশে একটা আপেল। তার

দুপুরের খাবার। আমি কী মনে করে যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে বললাম—"হ্যালো কেরোলিন"। সে চমকে উঠে দাঁড়াল। তার হাতের ধাক্কা লেগে কফির কাপ উল্টে গেল। চারদিকে কফি ছড়িয়ে বিশ্রী অবস্থা। আমি বললাম, তোমাকে চমকে দেয়ার জন্য দুঃখিত। কেরোলিন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ইটস ওকে। ইটস ওকে।

আমি বললাম, তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছ না। তুমি তো ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া কোনোদিকে তাকাও না। আমি যেহেতু ব্ল্যাকবোর্ড না, আমাকে চেনার কথাও না।

কেরোলিন মাথা নিচু করে বলল, আমি তোমাকে চিনি। তোমার নাম এরিখ। তুমি গতকাল একটা নীল ব্লেজার পরে ক্লাসে এসেছ। তার আগের দিন ইয়েলো স্ট্রাইপের ফুলহাতা শার্ট পরেছ। তার আগের দিন সাদা জাম্পার...

আমি হতভম্ব হয়ে কেরোলিনের দিকে তাকালাম। নিজের বিস্ময়ের ধাক্কা একটু সামলে নিয়ে বললাম—ক্লাসে কোন ছাত্র কী পরে আসে তা তুমি জান?

কেরোলিন নরম গলায় বলল, জানি।

পেপার কাপ থেকে কফি গড়িয়ে পড়ে টেবিল নষ্ট করছিল। কেরোলিন টেবিলে রাখা বইপত্র সরাতে গিয়ে সব এলোমেলো করে দিল। তার স্যান্ডউইচ এবং আপেল মেঝেতে পড়ে গেল। আমি বললাম, আমি খুবই দুঃখিত, তোমার লাঞ্চ নষ্ট করে দিয়েছি। সে আগের মতো বলল, ইটস ওকে। ইটস ওকে।

আমি বললাম, যেহেতু তোমার দুপুরের খাবার আমি নষ্ট করেছি, রাতের ডিনারটা কি আমি কিনে দিতে পারি? Can I ask you for a date?

কেরোলিন চুপ করে রইল। আমি বললাম—তোমার যদি অন্য কোনো পরিকল্পনা না থাকে তা হলে এসো রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার করি।

কেরোলিন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, ঠিক সাতটায় তুমি কান্ট্রি কিচেন রেস্তরাঁয় চলে এসো। কান্ট্রি কিচেন চেন তো—সাউথ বুলেভার।

কেরোলিন বিড়বিড় করে বলল, আমি চিনি।

'তা হলে সন্ধ্যা সাতটায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

আমি লাইব্রেরি থেকে চলে এলাম এবং সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিজের ওপর খুব রাগ হতে লাগল। কেন হঠাৎ মাথায় ভূত চাপল? কেন মেয়েটাকে 'ডেট'-এ নিতে চাচ্ছি? যে মেয়ে তার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা কে কবে কোন কাপড় পরছে তা হড়হড় করে বলে দিতে পারে তার কাছ থেকে পাঁচ শ হাত দূরে থাকা দরকার। জেনেশুনে আমি এত বড় ভুল কী করে করলাম? এমন তো না যে আমার ডেট পেতে সমস্যা হচ্ছে।

কান্ট্রি কিচেন রেস্তরাঁয় আমি সাতটার সময় উপস্থিত হলাম। কোনো মেয়েকে ডেটে ডেকে যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া বড় ধরনের অন্যায়। সেই অন্যায় আমি

করতে পারি না। আমি ভেবেছিলাম পৌঁছেই দেখব কেরোলিন রেস্টুরেন্টের বাইরে অবুথবু হয়ে খানিকটা কুঁজো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি মেঝের দিকে। মেঝের ডিজাইন জ্যামিতির কোনো সূত্রের সঙ্গে ফেলা যায় কি না তাই ভাবছে।

ঘটনা সে রকম হল না।

আমি কেরোলিনকে দেখে হোঁচটের মতো খেলাম। সে খুবই সেজেগুজে এসেছে। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। সুন্দর করে চুল বাঁধা। লাল স্কার্ট এবং সবুজ টপসে তাকে লাগছে ইন্দ্রাণীর মতো। এই মেয়ে যে সাজতে পারে এবং এতটা সেজে রেস্তরাঁয় আসতে পারে আমি তা কল্পনাও করি নি। আমি বললাম, কেরোলিন তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

কেরোলিন লজ্জা পেয়ে হাসল।

আমি বললাম, তোমাকে এই পোশাকটায় চমৎকার লাগছে।

কেরোলিন ফিসফিস করে বলল—থ্যাংক য়্যু।

ডিনার খেতে খেতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানলাম। যেমন—১. কেরোলিন বড় হয়েছে 'হোমে'। তার বাবা-মা কে সে জানে না। ২. আজ যে পোশাক সে পরে এসেছে ওটা আজই কেনা হয়েছে। স্কার্ট টপস এবং জুতা কিনতে লেগেছে তিন শ এগার ডলার। ৩. আজ সে জীবনের প্রথম ডেটে এসেছে। তাকে কখনো কোনো ছেলে ডেটে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে নি। ৪. পড়াশোনা করতে তার একেবারেই ভালো লাগে না। কিছু করার নেই বলেই সে পড়াশোনা করে। যদি কিছু করার থাকত তা হলে অবশ্যই পড়াশোনা করত না। ৫. তার সঙ্গে আমার মতো 'softly' কোনো ছেলে এর আগে কথা বলে নি।

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। ডিনারের মাঝামাঝি এসে আমার মনে হল, এই মেয়েটি সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে না থাকলে আমি বাঁচব না। আমি আমার বাকি জীবন এই মেয়েটির লাজুক মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব। আমি পুরোপুরি ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। পৃথিবীর সবচে রূপবতী মেয়েটি যেন আমার সামনে বসে আছে। যেন তাকে আমি শুধু আজ রাতের ডিনারের সময়টুকুর জন্যে পেয়েছি। ডিনার শেষ হলে সে চলে যাবে। আর তাকে পাব না।'

এরিখ দম নেবার জন্যে থামল। আমি বললাম, এ পৃথিবী একবার পায় তাকে, কোনোদিন পায় নাকো আর।

এরিখ বলল, তার মানে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমার অবস্থার কথা ভেবেই হয়তো আমাদের দেশের এক বাঙালি কবি এই লাইনগুলি লিখেছিলেন।

'কবির নাম কী?'

'কবির নাম জীবনানন্দ দাশ।'

'তুমি অবশ্যই সেই কবিকে আমার এপ্রিসিয়েশন পৌঁছে দেবে।'

'তিনি জীবিত নেই। কবিতার লাইনগুলি তাঁর জন্যেও প্রযোজ্য হয়ে গেছে। যাই হোক তুমি গল্প শেষ কর। আমার ধারণা সেই রাতেই তুমি মেয়েটিকে প্রপোজ কর।'

'তোমার ধারণা এক শ ভাগ সত্যি। আমেরিকান ছেলেরা মাঝেমধ্যে খুব নাটকীয় কায়দায় প্রপোজ করে। যেমন মেয়েটির সামনে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসে। দু হাত মুঠো করে প্রার্থনার ভঙ্গি করে বলে—"আমি তোমাকে আমার জীবনসঙ্গিনী হবার জন্যে প্রার্থনা করছি"।'

'তুমি তাই করলে?'

'হ্যাঁ। ডিনার শেষ করে তাই করলাম। কেরোলিনের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমাদের চারদিকে লোক জমে গেল। হাততালি পড়তে লাগল। এবং কান্ট্রি কিচেন রেস্তরাঁর মালিক রবার্ট উঁচুগলায় বলল—এই আনন্দময় ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কান্ট্রি কিচেনে উপস্থিত সবাই এক গ্লাস করে ফ্রি রেডওয়াইন পাবে। আনন্দের একটা জোয়ার শুরু হয়ে গেল।'

'তোমরা পরদিন বিয়ে করলে?'

'আমেরিকায় হুট করে বিয়ে করা যায় না। বিয়ের লাইসেন্স করতে হয়। সেই লাইসেন্সের জন্যে ডাক্তারি পরীক্ষা লাগে। আমরা ঠিক এক মাস দশ দিনের মাথায় বিয়ে করলাম। বিয়ে মানেই বিরাট ঘটনা। আমার জন্যে তা ছিল অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেবার মতো ঘটনা। আমার আনন্দের সীমা রইল না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করত হ্যান্ডমাইক নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি, সবাইকে বলি—হ্যালো হ্যালো কেরোলিন নামের মেয়েটি আমার। শুধুই আমার। মাঝে মাঝে রাতে ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রাখতাম। ঘুম ভাঙলে কী করতাম জান? কেরোলিনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তার ঘুম ভাঙাতাম না। শুধুমাত্র তার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে জেগে থাকতাম। আমার পাগলামির গল্প কেমন লাগছে?'

'ভালো লাগছে। কেরোলিনকে দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'আমার কাছে তার ছবি আছে। গল্পটা শেষ হোক তোমাকে দেখাব।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'আমার পাগলামি দেখে কেরোলিন খুব হাসলেও সে নিজেও কিন্তু কম পাগলামি করে নি। যেমন ধর সে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিল। তার মতো ছাত্রী পড়াশোনা ছাড়তে পারে এটা ভাবাই যায় না। তার যুক্তি হচ্ছে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে সে আমার দিকে নজর দিতে পারবে না। এটা তার পক্ষে সম্ভব না। তার কাছে আমি ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই গুরুত্বহীন। তার বিষয়ে খুব মজার ব্যাপার আছে। সেটা বলছি। প্লিজ হাসতে পারবে না।'

'তুমি নিশ্চিত থাক আমি হাসব না।'

'ও ঘুমাত খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে। সে তার পা দিয়ে আমার পা পেঁচিয়ে একটা গিট্টুর মতো করে ফেলত। হা-হা-হা।'

'মজার তো।'

'আমি তার নাম দিয়েছিলাম Princess knot.'

'বাংলা ভাষায় এটা হবে "গিট্টু কুমারী"। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—তোমরা আমেরিকার সবচে সুখী দম্পতি।'

'শুধু আমেরিকায় বলছ কেন? আমরা ছিলাম এই পৃথিবীর সবচে সুখী স্বামী-স্ত্রী।'

'ছিলাম মানে? কেরোলিন কোথায়?'

'বিয়ের দু বছরের মাথায় সে মারা যায়।'

'আই অ্যাম সরি।'

'বিয়ের এক বছর আট মাসের দিন তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। খারাপ ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের ক্যান্সার। কী কষ্ট যে সে করেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! শেষের দিকে এমন হল আমি চার্চে গিয়ে বলতে বাধ্য হলাম, "হে ঈশ্বর তুমি কেরোলিনের প্রতি করুণা কর। যেখান থেকে সে এই পৃথিবীতে এসেছে তাকে সেখানে নিয়ে যাও। রোগযন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দাও।" রোগটা তার মস্তিষ্কে ছড়িয়ে গেল। সে কাউকে চিনতে পারত না। আমাকেও না। তার কাছে গিয়ে কেরোলিন কেরোলিন বলে ডাকলে সে শুধু চোখ তুলে তাকাত, সেই দৃষ্টিতে পরিচয়ের আভাস মাত্র থাকত না।"

এরিখ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আহমেদ আমার গল্প শেষ হয়েছে। এখন ভালো করে কফি বানাও। কফি খেয়ে শুয়ে পড়ব। ঘুম পাচ্ছে।

আমি বললাম, লুপ্ত প্রাচীন লিপির ব্যাপারটা কিন্তু এখনো আসে নি।

এরিখ বলল, যে লিপির কথা বলছি ওটা কেরোলিনের লেখা। মৃত্যুর দুদিন আগে ইশারায় জানাল সে কিছু লিখতে চায়। আমি তাকে কাগজ-কলম দিলাম। সে সারা দিন শুয়ে শুয়ে লিখল। সন্ধ্যাবেলা লেখা শেষ হল। আমাকে লেখা কাগজটা দিয়ে কোথায় চলে গেল। তার দুদিন পর তার মৃত্যু হয়।

'সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা কোনো চিঠি?'

'হ্যাঁ।'

'সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখার দরকার পড়ল কেন?'

'আহমেদ সে-ই তো আমি বলতে পারব না। ক্যান্সারের আক্রমণে তার মস্তিষ্ক এফেকটেড হয়েছিল তার কারণে হতে পারে। কিংবা অন্য কিছুও হতে পারে। লিপির পাঠোদ্ধার করা গেলেই ব্যাপারটা জানা যাবে। কিংবা এমনও হতে পারে যে এটা আসলে কোনো লিপিটিপি নয়। কাগজে আঁকাবুকি কাটা। কেরোলিন আমাকে দিয়ে গেছে যেন এই লেখার রহস্য উদ্ধার করতে গিয়ে আমার জীবন কেটে যায়। আমি

তাকে হারানোর কষ্ট ভুলে থাকতে পারি। কেরোলিন মারা গেছে একুশ বছর আগে। এই একুশ বছর ধরে আমি চিঠিটার রহস্য উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। মানুষ ক্লান্ত হয়, আমি ক্লান্ত হই না। কেন ক্লান্ত হই না বল তো?'

'বলতে পারছি না।'

'ক্লান্ত হই না। কারণ, আমার মনে হয় কেরোলিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লাজুক ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে আমি তার রহস্য ভাণ্ডার চেষ্টা করছি কি না। হাল ছেড়ে দিচ্ছি কি না।'

'তুমি আর বিয়ে কর নি?'

'না, বিয়ে করি নি।'

আমি বললাম, যদি কখনো তুমি এই সাঙ্কেতিক লিপির অর্থ বের করতে পার তা হলে কি আমাকে জানাবে? কী লেখা আছে আমি জানতে চাচ্ছি না আমি শুধু জানতে চাই তোমার সাধনা সফল হয়েছে। তুমি সঙ্কেতের অর্থ ধরতে পেরেছ।

এরিখ বলল, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক আমি যদি পাঠোদ্ধার করতে পারি তুমি তা জানবে।

পিএইচ. ডি. ডিগ্রি নিয়ে আমি দেশে ফিরি ১৯৮৪ সনে। দশ বছর একনাগাড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টারি করি। লেখালেখির ব্যস্ততা খুব বেড়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করি। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় চিঠিপত্র জমা হয়—আমি আনতে যাই না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পেনশনসংক্রান্ত জটিলতার জন্যে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি। দেখি কয়েক বছরের চার-পাঁচ শ চিঠি। বিদেশ থাকা আসা চিঠিগুলি আলাদা করে বাসায় নিয়ে এলাম। একটি চিঠি এসেছে এরিখ স্যামসনের আইনজীবীর কাছ থেকে। আইনজীবী জানাচ্ছেন—তাঁর ক্লায়েন্ট এরিখ স্যামসন নিউমোনিয়ায় মারা গেছেন। ক্লায়েন্টের নির্দেশমতো আমাকে জানাচ্ছেন যে এরিখ স্যামসন মৃত্যুশয্যায় লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন।

প্রেসক্রিপশন

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম মাথাধরাকে পাত্তা না দিতে। অবহেলা কেউ সইতে পারে না। রোগও পারে না। রোগ যখন দেখে তাকে আমল দেয়া হচ্ছে না, অগ্রাহ্য করা হচ্ছে তখন সে মনমেজাজ খারাপ করে চলে যায়। আমার ক্ষেত্রে তা হল না। পাত্তা না পেয়ে মাথাধরা আরো বাড়ল। এক সময় লক্ষ্য করলাম মাথাধরাটা মেরুদণ্ড বেয়ে নিচে নামার পরিকল্পনা করছে। ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন—আমি একটা ফার্মেসিতে ঢুকে পড়লাম। চারটা প্যারাসিটামল কিনব। দুটা খেয়ে দুটা ভবিষ্যতের জন্যে পকেটে রেখে দেব।

আমার অনেকদিনের অভ্যাস যে কোনো দোকানে ঢোকার আগে দোকানের নাম পড়ি। মাঝেমধ্যে সুন্দর সুন্দর নাম চোখে পড়ে। বেশ মজা লাগে। একটা ষ্টেশনারি দোকানের নাম পেয়েছিলাম—'নীলাচল'। আরেকটা রেষ্টুরেন্টের নাম 'ঝাল-ঝোল'। সাধারণত দেখেছি সুন্দর নামের দোকানগুলি বেশিদিন চলে না। ঝাল-ঝোল এক মাসের মধ্যে উঠে গেল। নতুন এক রেষ্টুরেন্ট চালু হল। নাম—দি নিউ মদিনা বিরিয়ানী এন্ড কাবাব ঘর। সাইনবোর্ডে হাস্যমুখী দাড়িওয়ালা ছাগলের ছবি। এই রেষ্টুরেন্টটা বেশ চলছে।

যে কথা বলছিলাম—ফার্মেসিতে ঢোকার আগে চট করে নাম পড়ে নিলাম। নতুন কোনো নাম না হলেও আধুনিক নাম 'প্রেসক্রিপশন'। আমার কাছে মনে হল নামটা শুধু যে আধুনিক তা-ই নয়, বেশ জুতসই নাম। প্রেসক্রিপশন মানেই তো ফার্মেসি।

চারটা প্যারাসিটামলের দাম চার টাকা। মাথাধরা নামক অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির জন্য বড়ই সস্তা চিকিৎসা। সেলসম্যানকে পানি দিতে বললাম। সে গ্লাসে করে পানি এনে দিল। দুটা ট্যাবলেট তখনই খেয়ে ফেললাম। ওষুধের দাম দিতে গিয়ে আমি হতভম্ব। মনিব্যাগ সঙ্গে নেই। পকেটমার হয় নি এটা জানি। বাসা থেকে মনিব্যাগ

ছাড়াই বের হয়েছি। দুটা ট্যাবলেট গিলে না ফেললে ফিরিয়ে দেয়া যেত। আমি খুবই লজ্জার মধ্যে পড়লাম। কী বলব বুঝতে পারছি না। সেলসম্যানও যেন কেমন কেমন করে তাকাচ্ছে।

দোকানের মালিক মনে হয় দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে গম্ভীরমুখে বললেন, আপনি একটু আমার ঘরে আসবেন? চারটা টাকার জন্যে কঠিন কিছু কথা শুনতে হবে কি না বুঝতে পারছি না।

আমি তাঁর ঘরে ঢুকলাম এবং হড়বড় করে বললাম, ওষুধের দাম দিতে পারছি না। কাল ভোরে আমি এসে দিয়ে যাব।

মালিক ভদ্রলোক বললেন, সামান্য দুটা ট্যাবলেটের দাম দিতে না পারায় আপনি এরকম করছেন? তাই এক কাজ করুন—দুই পাতা ট্যাবলেট নিয়ে যান। এর দাম আপনাকে দিতে হবে না। আর শুনুন আপনি আমার সামনের চেয়ারে বসুন। চা দিতে বলছি, গরম চা খান, মাথাধরাটা কমবে।

আমি ভদ্রলোকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দিনকাল পাল্টে গেছে, প্রিয়জনদের কাছ থেকেই ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় না, আর এই ভদ্রলোক নিতান্তই অপরিচিত একজন। আমি বললাম, আপনার নামটা জানতে পারি?

ভদ্রলোক বললেন, অবশ্যই পারেন। আমার এমনই নাম যে একবার শুনলে কখনো ভুলবেন না। আমার নাম কয়লা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কয়লা?

'হ্যাঁ কয়লা। রসিকতা করছি না। আসলেই আমার নাম কয়লা। জন্মের সময় গায়ের রং ছিল খুবই ফরসা। আমার বাবা রহস্য করে বললেন, আমার ছেলে এমন কয়লার মতো কালো হল ব্যাপারটা কী? সেই থেকে কয়লা নাম। ঠাট্টা করে কয়লা ডাকতে ডাকতে—কয়লা। ভালো নাম মোহম্মদ সানোয়ার হোসেন।'

সানোয়ার সাহেবের দিকে ভালো করে তাকালাম। ভদ্রলোকের গায়ের রঙই যে শুধু সুন্দর তাই না, দেখতেও সুন্দর। বয়স চল্লিশের মতো হবে। চুলে পাক ধরেছে। তার জন্যে মনে হয় ভদ্রলোককে আরো সুন্দর লাগছে। কিছু মানুষ আছে যাদের পাকা চুলে মানায়।

'আপনার মাথাধরার অবস্থা কী?'

'কমে আসছে।'

সানোয়ার সাহেব রহস্যময় গলায় বললেন, এক মিনিটের জন্যে চোখটা বন্ধ করবেন?

'কেন?'

'আপনার কপালে এবং চোখে একটা মলম লাগিয়ে দেব? বার্মিজ মলম। নাম টাইগার বাম। লাগাবার তিন মিনিটের মধ্যে মাথাধরা চলে যাবে।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম। ভদ্রলোক চোখের পাতায় এবং কপালে বাম ঘষে দিলেন। খুবই আরামদায়ক ম্যাসাজ। ম্যাসাজের কারণেই মনে হয় ব্যথা অর্ধেক কমে গেল।

'তিন মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখবেন। খুলবেন না।'

আমি চোখ বন্ধ করেই বললাম—আপনার দোকানে মাথাধরা নিয়ে যারা আসে তাদের সবার চোখেই কি আপনি টাইগার বাম ঘষে দেন?

'না, দেই না। আপনি লেখক মানুষ আপনার জন্যে অন্য ব্যবস্থা।'

'ও আচ্ছা।'

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে গরম শিঙ্গাড়া। আগুনগরম শিঙ্গাড়া সব সময় ভালো হয়—এটা মনে হল আরো ভালো। চা-টা শিঙ্গাড়ার মতো ভালো না হলেও খারাপ না। লেখক হিসেবে মাঝেমধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছু খাতির-যত্ন পাই। বড় মাপের লেখকরা এ ধরনের খাতির-যত্নে বিব্রত এবং বিরক্ত হন। যেহেতু আমি খুবই ছোট মাপের একজন—আমি খুশি হই। অবিশ্যি চেষ্টা থাকে খুশি চেপে রাখার।

চা খেতে খেতে আমি ভদ্রলোকের বসার ঘর দেখলাম। তাঁর ফার্মেসির নামে যেমন রুচির পরিচয় পাওয়া যায় ঘর থেকেও পাওয়া যায়। সুন্দর করে সাজানো ঘর। মেঝেতে কার্পেট। চারদিকে নানান ধরনের ইনডোর প্ল্যান্ট রাখা। একটা প্ল্যান্টে আবার বোতামের মতো নীল ফুল ফুটেছে। অপূর্ব দেখাচ্ছে। ব্যবসায়ী মানুষের বসার ঘরে সাধারণত প্ল্যান্ট দেখা যায় না। ভদ্রলোকের টেবিলে দুটা বই, একটার নাম

Doomsday

And

Life after death.

অন্যটার নাম পড়া যাচ্ছে না। সেটিও নিশ্চয় গল্প-উপন্যাসের বই না, সিরিয়াস কোনো বই। দেয়ালে ভদ্রলোকের যুবক কালের ছবি। সাইকেলে হেলান দিয়ে তোলা। ঠোঁটে সিগারেট।

সানোয়ার সাহেব বললেন, আমার বাবার ছবি।

'আমি ভেবেছিলাম আপনার যুবক বয়সের ছবি।'

'অনেকেই তাই ভাবেন। অফিসঘরে নিজের ছবি টাঙিয়ে রাখব এত অহংকার এখনো আমার হয় নি।'

আমি বললাম, আপনার বাবা অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। সিনেমার নায়কের মতো চেহারা।

সানোয়ার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, আমার বাবা জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন ছবিতে ঢোকার কৌশল বের করতে গিয়ে। তিনি সকালবেলা এফডিসিতে ঢুকতেন, রাত এগারটা-বারটার সময় ফিরতেন। যেতেন খুব সেজেগুজে।

পরিচালকদের অ্যাসিস্ট্যান্টদের সিগারেট খাওয়াতেন। তাদের যে কোনো ফরমাশ নিমিষের মধ্যে করে দিতেন। এর বিনিময়ে হঠাৎ হঠাৎ পাসিং শটে সুযোগ পেতেন।

'পাসিং শট মানে?'

'পাসিং শট হচ্ছে—ধরুন ছবির কোনো দৃশ্য হচ্ছে। নায়ক-নায়িকা গল্প করছে। অনেক দূর দিয়ে একটা লোক হেঁটে চলে গেল। মূল গল্পের সঙ্গে সেই লোকের কোনো সম্পর্ক নেই। লোকটা হেঁটে যাওয়ায় ফ্রেমটা ভরাট লাগবে। সেই লোকের শটটাকে বলে পাসিং শট।'

'ও আচ্ছা।'

'পরিচালক বা প্রযোজকের নজরে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা একেবারে বিফলে গেল না। বাবা তাদের নজরে না পড়লেও একজন এক্সট্রা মেয়ের নজরে পড়লেন।'

'এক্সট্রা মেয়ে মানে কী?'

'নায়িকার অসংখ্য সখীরা হল এক্সট্রা। নায়িকা যখন পানি তুলতে যায় তখন এরাও যায়। পানি তোলা পর্বে যে কোমরদুলানি নৃত্য হয় সেই নৃত্যে তারা অংশগ্রহণ করে। বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ পারছি।'

'এক্সট্রা মেয়েটির সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠতা অতি দ্রুত তুঙ্গ স্পর্শ করল। এবং এক শুভ দিনে বাবা তাকে বিয়ে করে ফেললেন। বাবার তখন সম্বলের মধ্যে আছে তাঁর সুন্দর চেহারা এবং একটা হারকিউলিস সাইকেল। সাইকেলের চাকায় হেলান দেয়া ছবিটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। পাচ্ছেন না?'

'পাচ্ছি।'

'বাবার গল্প বলে আপনাকে মনে হয় খুব বোর করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্প শেষ হবে। আমার গাড়ির ড্রাইভার চলে এসেছে। আপনি যেখানে যেতে চান আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।'

'গাড়ি লাগবে না ভাই। আমি খুব কাছেই থাকি, হেঁটে চলে যাব।'

'হেঁটে আপনাকে যেতে দেয়া হবে না। আপনাকে জোর করে হলেও গাড়িতে তুলে দেয়া হবে। আমার বাবার সম্পদের মধ্যে ছিল একটা সেকেন্ডহ্যান্ড সাইকেল আর আমার এখন তিনটা গাড়ি। আমি গাড়িগুলি ডিসপ্লে করব না?'

'আপনার তিনটা গাড়ি?'

'এই মুহূর্তে অবিশ্যি দুটা। একটা বিক্রি করে দিয়েছি। তবে একটা লাক্সারি মাইক্রোবাস কিনব বলে ভাবছি। আপনি ভাববেন না ছোট এই ফার্মেসি থেকে এত আয় হয়। আমার অন্য ব্যবসা আছে। গুলশান এলাকায় একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের দালালি টাইপ কিছু কাজও করি, তবে আমি ব্যবসা শুরু করি ফার্মেসি দিয়ে।'

'ও আচ্ছা।'

'মূল গল্পটা শেষ করি। নিন সিগারেট খান। সিগারেট খেতে খেতে গল্প শুনুন। গল্পের শেষটা ইন্টারেস্টিং।'

আমি সিগারেট ধরালাম। এর মধ্যে আবার চা এল। এবারের চা খেতে ভালো। চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প শুনছি। সানোয়ার সাহেবের গল্প বলার কায়দা ভালো। হড়বড় করে গল্প বলেন এবং মোক্ষম জায়গায় এসে দম নেন। আবার শুরু করেন। গল্পটা এমন ভাবে বলেন যাতে মনে হয় গল্পটার প্রতি তিনি কোনো আকর্ষণ বোধ করছেন না। নেহায়েত গল্প করতে হয় বলে গল্প করছেন। গল্পটা করতে না পারলে তাঁর ভালো লাগত।

'বাবা থাকতেন তাঁর এক দূরসম্পর্কের চাচার বাসায় খিলগাঁয়। যে চাচার বাসায় থাকতেন তাঁর ছোট মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন এরকম ধারণা বাবা সম্ভবত দিয়ে রেখেছিলেন। নয়তো বাবার সেই ধুরন্ধর চাচা বাবাকে এতদিন পুষতেন না। হঠাৎ এক্সট্রা মেয়ে বিয়ে করে ফেলায় বাবার সেই চাচা তৎক্ষণাৎ বাবাকে বের করে দিলেন। নতুন বউ নিয়ে বাবা পড়লেন মহা বিপদে। এই আত্মীয়ের বাড়ি কয়েকদিন, সেই আত্মীয়ের বাড়ি কয়েকদিন এইভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। ঢাকা শহরে যত আত্মীয় ছিল, সব কাভার করা হয়ে গেল।

বাবা ফিল্মপাড়ায় কাজের চেষ্টা করতে লাগলেন। শো বিজনেসের সঙ্গে জড়িত কোনো কাজেই তাঁর আপত্তি নেই। ফ্লোর ঝাঁট দেয়া, আর্টিস্টের মাথায় ছাতা ধরা, ম্যাডামের স্যান্ডেল এগিয়ে দেয়া—সবকিছুতেই তিনি রাজি। প্রডাকশন বয়ের কাজ। গাধার খাটুনি, সেই তুলনায় বেতন নামমাত্র। খাওয়াটা অবিশ্যি ফ্রি পাওয়া যায়। সামান্য চুরির সুযোগও আছে। বাবা সেই সুযোগ কখনো নিতে পারেন নি। কারণ মানুষ হিসেবে তিনি বোকা ছিলেন। বোকা মানুষরা সৎ হয় এটা জানেন তো? বোকাদের ভেতর চোর নেই বললেই হয়।

এই মহা দুর্যোগে বাবার এক ছেলে হয়ে গেল। ছেলের নাম রাখা হল সানোয়ার হোসেন। বাবা আদর করে ছেলেকে ডাকতেন কয়লা বাবা।'

'আপনিই সেই কয়লা বাবা?'

'জি।'

'আপনারা তখন থাকতেন কোথায়?'

'বাবা এফডিসির কাছেই এক বস্তিতে ঘর ভাড়া করেছিলেন। ঘরের ভাড়া নামমাত্র। তবে সেই নামমাত্র ভাড়ার টাকা যোগাড় করাও বাবার কাছে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। গল্পটার প্রায় শেষ অংশে চলে এসেছি। আরেকটা সিগারেট ধরান। সিগারেট শেষ হতে হতে গল্প শেষ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, আপনি ধীরেসুস্থে গল্প শেষ করুন। আমার এমন কোনো তাড়া নেই। তা ছাড়া গল্পটা শুনতে ভালো লাগছে।

সানোয়ার সাহেব হাসিমুখে গল্প শুরু করলেন—'আমার জন্ম হয়েছিল এক ঈদের দিনের ভোরবেলায়। সেই কারণে বাবার ধারণা হয়েছিল তাঁর ছেলে সৌভাগ্যবান। সে তার বাবার ভাগ্য বদলে দেবে। সেরকম কিছু লক্ষণও দেখা দিল। আমি সাত দিন বয়স থেকেই রোজগার শুরু করলাম। আমার চেয়ে অল্প বয়সে কেউ রোজগার করতে নেমেছে বলে আমি জানি না। গিনিস রেকর্ড বুকে আমার নাম যাওয়া উচিত ছিল।'

'সাত দিন বয়সে রোজগার মানে? কী রকম রোজগার?'

'অভিনয় করে রোজগার। ফ্লিম লাইনে নবজাত শিশু প্রায়ই লাগে। নায়িকার বাচ্চা হয়েছে। সেই বাচ্চা চুরি হয়ে গেল। এ ধরনের গল্পে বাচ্চা লাগবে। আমি হলাম সেই বাচ্চা। অভিনয় করার দরকার নেই। হাত-পা নাড়তে পারলেই হল, চিৎকার করে কাঁদতে পারলেই হল। সাত দিন বয়সে আমি প্রথম ছবি করতে নামলাম—ছবির নাম ডালিম কুমার। আমিই সেই ডালিম কুমার।'

'ইন্টারেস্টিং তো!'

'হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং তো বটেই। আমার দু নম্বর ছবির নাম—কমলা সুন্দরী। দু নম্বর ছবি করতে গিয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শীতের রাতে শুটিং হচ্ছিল। দৃশ্যটা এরকম—জন্মের পর আমাকে একটা খলুইয়ে ভরে জঙ্গলে ফেলে আমার দুঃখিনী মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছেন। আমি খলুইয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছি। বনের পশুপাখি আমাকে দেখে যাচ্ছে। এক সময় আমার ঘুম ভাঙল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। সেই দেশের রাজা আবার ঠিক তখনই মৃগয়ায় এসেছিলেন। তিনি আমার কান্নার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমাকে খলুই থেকে তুলে নিয়ে গেলেন। তিনিই আমার কমলার মতো রূপ দেখে আমার নাম দিলেন কমলা সুন্দরী। এই ছবিতে আমি মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।'

'হ্যাঁ বুঝতে পারছি।'

'কমলা সুন্দরীতে অভিনয় করতে গিয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শীতের রাত। অনেকগুলি টেক নিতে হয়েছে। আমার গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। বুকে ঠাণ্ডা বেঁধে গেল। জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিল। আমাকে ভর্তি করাতে হল হাসপাতালে। এর মধ্যে বস্তির বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। বাড়িওয়ালা সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা এসে শাসাচ্ছে—সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে "ঘোর অমানিশা"। তখন হঠাৎ আমার বাবার কপাল খুলল। চিত্রজগতের একজন খুন হলেন।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, চিত্রজগতের একজন খুন হবার সঙ্গে আপনার বাবার কপাল খোলার ব্যাপারটা ধরতে পারছি না।

সানোয়ার সাহেব হাসিমুখে বললেন, ধরিয়ে দিচ্ছি। এমন কিছু জটিল ব্যাপার না। আপনি কি জানেন শাস্তি কেনাবেচা হয়? একজনের শাস্তি অন্যজন টাকার বিনিময়ে নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেয়। অপরাধীর শাস্তি হয় না—টাকা খেয়ে যে অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়েছে তার শাস্তি হয়।

'আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আরো সহজ করে ব্যাখ্যা করি। ধরুন আপনি ক্লাসে পড়া পারেন নি। শাস্তি হিসেবে আপনার গালে চড় দেবার কথা। সেই চড় আপনার হয়ে অন্য কেউ খেল। আপনার কিছু হল না।'

'এরকম কি হয়?'

'অবশ্যই হয়। শাস্তি কেনাবেচার মার্কেট আছে। আপনার যদি প্রচুর টাকা থাকে আপনি খুন করতে পারেন। নিজের হাতেই করতে পারেন। আপনাকে তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে না। অন্য একজন আপনার হয়ে ফাঁসিতে ঝুলবে।'

আমি হতভম্ব হয়ে সানোয়ার সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, আমার বাবা ঠিক এই কাজটি করলেন। তিনি পুলিশের কাছে বললেন, খুন তিনি করেছেন। কীভাবে খুনটা করেছেন তার বিশদ বর্ণনা দিলেন। তাঁর কথামতো যে ছুরিতে খুন করা হয়েছে সেই ছুরি বাবার বস্তির বাসার মুড়ির টিনের ভেতর থেকে বের হল। অন্যের অপরাধে তাঁর বিচার শুরু হল। বিনিময়ে তিনি তাঁর পরিবারের জন্যে রেখে গেলেন চার লাখ দশ হাজার টাকা।

'আপনার বাবার কী শাস্তি হয়েছিল?'

'উনার ফাঁসি হয়েছিল। তাই আমার গল্প শেষ হয়েছে। আপনার জন্যে গাড়ি রেডি আছে। আপনাকে নিয়ে যাবে।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, আই অ্যাম সরি।

সানোয়ার সাহেব আমার দিকে রাগী চোখে তাকালেন। মনে হল তিনি হঠাৎ রেগে গেলেন। আবার সেই রাগ সামলে নিয়ে বললেন—বাবার মামলা ঘাড়ে চার বছর ধরে চলেছে। বাবার যখন ফাঁসি হয় তখন আমার বয়স পাঁচ। ফাঁসির আগে আগে আমাকে কোলে নিয়ে মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বাবা আমাকে অনেক আদর করলেন। বাবার সম্পর্কে আমার কোনো স্মৃতি নেই—শুধু আদরটা মনে আছে। আদর করতে করতে তিনি বলছিলেন—কুটু কুটু মুটু মুটু টুটু টুটু।

আমি চুপ করে আছি। গল্পের শেষটা এ রকম নাটকীয় হবে ভাবতে পারি নি। ভদ্রলোকের সামনে বসে থাকতে তখন আর ভালো লাগছে না। কোনো ছুতায় উঠে যেতে পারলে ভালো হয়। তেমন কোনো ছুতাও পাচ্ছি না।

সানোয়ার সাহেব বললেন, গল্পটা কেমন লাগল?

আমি প্রশ্নের জবাব দিলাম না। চুপ করে রইলাম। সানোয়ার সাহেব থেমে থেমে বললেন, আপনি গল্পকার মানুষ। ইন্টারেস্টিং গল্প আপনারা তৈরি করেন—ছোট প্রাণ ছোট কথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা টাইপ—। আমার গল্পটা কি আপনাদের ছোটগল্পের থিওরিতে পড়ে?

আমি বললাম, ভাই আজ উঠি, আরেক দিন এসে কথা বলব।

সানোয়ার সাহেব শান্ত গলায় বললেন, গল্প শেষ হবার পরেও কিন্তু কিছু বাকি থাকে। সেটাকে বলে পরিশিষ্ট। আমার গল্পটার একটা পরিশিষ্ট আছে। পরিশিষ্টটা শুনে যান।

'বলুন শুনছি।'

'আমার বাবা আসলে ছিলেন ভাগ্যবান মানুষ। সাধারণ মানুষের বেশির ভাগ স্বপ্নই অপূর্ণ থাকে। শুধু ভাগ্যবান মানুষের সব স্বপ্ন পূর্ণ হয়। বাবার সব স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছিল সেই অর্থে তিনি ভাগ্যবান। তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। তিনি নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন সিনেমার নায়ক হবেন। তাঁর বেলায় সেই স্বপ্ন না পূর্ণ না হলেও—তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়। আমার মা বেশকটি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন।'

'ও।'

'যার খুনের শাস্তি বাবা ঘাড় পেতে নিয়েছিলেন—সেই লোকই মাকে এইসব সুযোগ করে দেয়। মজার ব্যাপার হল মা তাকে বিয়েও করেন। নায়িকারা ছবির প্রডিউসারকে বিয়ে করেই থাকে। এটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। আপনি কী বলেন?'

সানোয়ার সাহেব উত্তরের আশায় আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি তাকিয়ে আছি হারকিউলিস সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর বাবার দিকে।

শবযাত্রা

আমি আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে মানুষটাকে দেখছি। গ্রামের আর দশটা মানুষের থেকে তাকে আলাদা করার কিছু নেই। তার প্রতি কৌতূহলী হবারও কোনো কারণ নেই।

কাঁচা-পাকা চুল, রোদে জ্বলে যাওয়া খসখসে চামড়া, চোখে ভরসাহারা দৃষ্টি। মানুষটা আমার সামনে বেঞ্চিতে বসে আছে। বসে থাকার ভঙ্গিটাও ক্লান্তির। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে। আমাদেরকে ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। তাদের চোখেও কৌতূহল। তারা মজার কোনোকিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। অনেকের মুখেই চাপা হাসি।

আমি লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আপনার নাম কী?

লোকটা সহজভাবে উত্তর দিল, আমার নাম রহমান মিয়া।

আমাদের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে তারা এই উত্তরেই মনে হয় মজা পেয়ে গেছে। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। সবার মুখই হাসি হাসি। রহমান মিয়া নাম শুনে হাসি পাওয়ার কী আছে বুঝতে পারছি না। লোকটাকে দ্বিতীয় কী প্রশ্ন করব তাও বুঝতে পারছি না। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে চারপাশের কৌতূহলী দর্শক চাচ্ছে আমি লোকটির সঙ্গে কথা বলি। মজাটা যেন থেমে না থাকে। চলতে থাকে।

'আপনার শরীর ভালো?'

'জি ভালো।'

'আপনার ছেলেমেয়ে কী?'

'সর্বমোট চার জন।'

উপস্থিত দর্শকদের একজন বলল, স্যার, ছেলেমেয়েদের নাম জিজ্ঞেস করেন।

যে ভঙ্গিতে সে কথাটা বলল তাতে বোঝা যাচ্ছে নাম জিজ্ঞেস করার পরই আসল মজা শুরু হবে। কাজেই আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার ছেলেমেয়েদের নাম কী?

'দুই মাস উনিশ দিন।'

দর্শকদের হাসি প্রবল হল এবং আমিও বুঝলাম কলঘাটি থেকে পঞ্চাশ টাকা রিকশা ভাড়া কবুল করে এই লোকটিকে আমার কাছে আনার কারণ আছে। তবে কারণটা যথেষ্ট না। লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা-খারাপ একজন মানুষ অনেক কিছুই বলতে পারে। তাকে নিয়ে মজা করা যায় না।

'আপনি নিশ্চিত যে বৈশাখ মাসে আপনি মারা গেছেন?'

'জি।'

'আপনার কবর হয়েছিল, না হয় নি?'

'কবর খোদা হয়েছিল, কিন্তু আমারে কবরে নামায় নাই।'

'কেন?'

'আমি তখন উঠে বসেছি। জিন্দা মানুষের মতো কথা বলেছি। পানি খেতে চেয়েছি। সবাই ভাবছে আমি জিন্দা।'

'আসলে আপনি জিন্দা না?'

'জি না।'

'আপনি মারা গেছেন, কিন্তু আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই আছে?'

'আছে। আগের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু আছে। কেন যে আছে এইটাও বুঝি না।'

কথোপকথন এই পর্যায়ে বন্ধ করতে হল। কারণ আমার নাশতা খাবার ডাক এসেছে। যে বাড়িতে আমি উঠেছি সে বাড়ির কর্তা (হেডমাস্টার, সোহাগী হাইস্কুল) আমাকে ডাকতে এসেছেন। হেডমাস্টারদের চোখে ভুবনবিখ্যাত যে বিতৃষ্ণা থাকে, সেই বিতৃষ্ণা নিয়ে তিনি রহমানের দিকে তাকালেন। আশপাশের লোকদের দিকে তাকালেন এবং সমস্ত বিতৃষ্ণা চোখের নিমিষে এক পাশে সরিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় বললেন, স্যার, একটু বিষয় আছে। ভিতরে আসেন।

বেশ কিছু নতুন নতুন জিনিস আমি গ্রামে এসে লক্ষ্য করছি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে লোকসমক্ষে উচ্চারণ করা হয় না। "স্যার, নাশতা খেতে আসুন" বলায় কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু আমাকে বলা হচ্ছে—একটা বিষয় আছে। খাওয়াদাওয়াকে "বিষয়" বলা কি গ্রামে সর্বজনীন না এই বাড়িটির বিশেষত্ব তা এখনো বুঝতে পারছি না।

আমি হেডমাস্টার সাহেবের আশ্রয়ে গত তিন দিন ধরে আছি। তিনি যথেষ্ট আদরযত্ন করছেন। তবে কী কারণে যেন তাঁর ধারণা হয়েছে আমি 'বোকা টাইপ' মানুষ। জগতের জটিলতা থেকে আমাকে দূরে রাখা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। হেডমাস্টার সাহেব এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন। পারলে একটা কাচের বৈয়মে ভরে আমাকে শিকায় ঝুলিয়ে রাখতেন। সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে একটু মনঃক্ষুণ্ন।

হেডমাস্টার সাহেবের হাতে আমি কী করে পড়লাম, সেই গল্প এখানে অবান্তর। তবু বলে নিচ্ছি, তা হলে আমার অবস্থানটা পরিষ্কার হয়।

একটি দৈনিক পত্রিকায় আমি প্রতি সপ্তাহে কলাম লেখি। কলামের নাম 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'। হালকা বিষয়বস্তু নিয়ে হালকা কলাম। যেমন ঢাকা নগরীর ভিক্ষুক। নগরীর সৌন্দর্যের এরাও যে একটা অংশ এইসব হাবিজাবি। একটা কলাম লিখলাম ঢাকা শহরের অবহেলার পাখি 'কাক' নিয়ে। যখন যা মনে আসে তা নিয়ে লেখা। যেহেতু কলামগুলি রাজনৈতিক নয় কাজেই কেউ সেসব গুরুত্বের সঙ্গে পড়ে বলে আমার কখনো মনে হয় নি। আমার সব সময় মনে হত আমি এবং পত্রিকার কম্পোজিটর আমরা দুজনই 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' কলামের নিবিষ্ট পাঠক।

এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হল যখন আমার স্কুলের এক বন্ধু টেলিফোন করে বলল, 'তোর একটা কলাম পড়ে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেছে।' আমি খুবই চিন্তিত বোধ করলাম। রোমহর্ষক কোনো কলাম লিখেছি বলে মনে পড়ল না। আমি বললাম, কোন লেখাটার কথা বলছ?

সে অতিরিক্ত রকম আগ্রহের সঙ্গে বলল, ওই যে জোছনা নিয়ে লেখা। দোস্ত, তোর লেখাটা আমি অফিসের সবাইকে পড়ে শুনিয়েছি।

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা না। মারাত্মক লিখেছিস। স্কুলে র‍্যাপিড রিডারে পাঠ্য হবার মতো লেখা। অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে।'

বন্ধুর উৎসাহে নিজেকে যুক্ত করতে পারলাম না—কারণ লেখাটা এমন কিছু না। আমার অন্যসব লেখার মতোই হালকা, গভীরতাহীন। লেখাতে আমি ঢাকার মেয়রকে অনুরোধ করেছিলাম, নাগরবাসীকে পূর্ণিমা দেখার তিনি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেন। ভরা পূর্ণিমার সময় ঢাকা নগরে তিনি যেন দু ঘণ্টার জন্যে হলেও ইলেকট্রিসিটি অফ রাখেন। সেখান থেকে চলে গেছি গ্রামের বাঁশঝাড়ের পূর্ণিমায়। যে পূর্ণিমার নাম কাজলা দিদির পূর্ণিমা। লেখাটি শেষ করেছি গৃহত্যাগী পূর্ণিমায়। যে পূর্ণিমায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ স্ত্রী–পুত্র ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

আমার বন্ধু বলল, দোস্ত তুই আমাকে পারমিশন দে, আমি তোকে কাজলা দিদির বাঁশবাগানের জোছনা দেখিয়ে আনব। তখন তুই এ রকম আরেকটা লেখা লিখতে পারবি। একটা ফাটাফাটি হয়ে যাবে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

'তোর অ্যাপয়েনমেন্ট বুকে লিখে রাখ নেক্সট পূর্ণিমা কাজলা দিদির বাঁশবাগানের জোছনা। কথা দিচ্ছিস?'

'পূর্ণিমার তো দেরি আছে। এখনই কথা দিতে হবে?'

'হ্যাঁ, এখনই কথা দিতে হবে। আমি সরকারি চাকরি করি। তোর মতো কাড়া

হাত-পা না যে যখন তখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারি। আমাকে আগেই ছুটির দরখাস্ত করতে হবে। বল, ইয়েস।'

আমি ইয়েস বলে ফেঁসে গেলাম। আমাকে একা নেত্রকোনা জেলার এই অতি অজ পাড়াগাঁয়ে এসে উপস্থিত হতে হয়েছে। কারণ বন্ধুটি শেষ মুহূর্তে ছুটি পায় নি। যেহেতু আগেই সব খবর দেয়া, আমাকে একাই আসতে হয়েছে। আমি না এলে বন্ধুর ইজ্জত থাকে না। সে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

পূর্ণিমা দেখার যে বিপুল আয়োজন হয়েছে তা খুবই হাস্যকর, কিন্তু আমি হাসতেও পারছি না। হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ির কাছে বিশাল এক বাঁশবন শলার ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। জঙ্গলে যা হয়—বাঁশগাছের সঙ্গে অন্য কিছু গাছও থাকে। সেইসব গাছ কুড়াল দিয়ে কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। কারণ হেডমাস্টার সাহেবকে জানানো হয়েছে আমি বাঁশবনের জোছনা দেখতে চাই। বনের মাঝখানে চেয়ার-টেবিল পাতা হয়েছে। আমি চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রেখে জোছনা দেখব।

সমস্যা হচ্ছে গত তিন দিন ধরে আকাশ মেঘলা। চাঁদের দেখা নেই। গত রাতে পূর্ণিমা ছিল—চাঁদের দেখা পাওয়া যায় নি। বৃষ্টি পাওয়া গেছে। সারা রাতই বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃষ্টি না হলেও আকাশ মেঘে মেঘে কালো। আমি এক শ ভাগ নিশ্চিত সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। আমি তাতে মোটেই দুঃখিত বোধ করছি না। আগামীকাল সকালে ঢাকায় চলে যেতে পারছি এতেই আমি আনন্দিত। পুরোপুরি নগরবাসী মানুষের জন্যে গ্রামের সব অভিজ্ঞতা সুখকরও না। গ্রামে বাস করতে এলে ধাক্কা খেতেই হবে।

ঢাকা শহরে আমি নিশ্চয়ই এমন কাউকে পাব না যার ধারণা গত দু মাস উনিশ দিন ধরে সে মৃত। যদি কেউ থেকেও থাকে—তার আত্মীয়স্বজন তার চিকিৎসা করবে। যত্ন করে ঘরে রেখে পুষবে না। দর্শনীয় বস্তু হিসেবে তাকে ভাড়া করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেবেও না।

হেডমাস্টার সাহেবের সব আয়োজনেই বাড়াবাড়ি থাকে। বৈকালিক নাশতার আয়োজন গুরুতর। নাশতা হিসেবে পোলাও করা হয়েছে। পোলাও এবং গরুর ভুনা মাংস।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এটা বিকালের নাশতা?

হেডমাস্টার সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, কফি আনিয়েছি। খানার পর কফি আর নোনতা বিস্কুট। আমি যথেষ্ট পরিমাণ আশ্বস্ত হয়ে পোলাও খেতে বসলাম। কারণ 'না' বলে লাভ হবে না। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে 'না' শব্দটির সঙ্গে এরা পরিচিত নয়। অতি সুখাদ্যও যে মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছা করে না এই ধারণা সম্ভবত গ্রামের মানুষের নেই।

ঘিয়ে জবজবা পোলাও মুখে দিতে দিতে বললাম, রহমান মিয়া লোকটা সম্পর্কে হেডমাস্টার সাহেব আপনি কী জানেন?

হেডমাস্টার মুখভরতি পোলাও নিয়ে বললেন, হারামজাদাকে জুতাপেটা করা উচিত। ইডিয়ট।

আমি বললাম, কেন বলুন তো?

'ফাজলামি করছে না! সে জিন্দা না মুর্দা এটা সে বলার কে? এটা হল দশজনের বিবেচনা।'

'আপনাদের বিবেচনায় সে জিন্দা?'

'অবশ্যই। এমবিবিএস ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে যে বেঁচে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে পাস করা ডাক্তার এসেছিল?

'জি এসেছিল। পালস দেখেছে। ব্লাড প্রেসার মেপেছে। পালস একটু ডাউন আছে তবে প্রেসার নরম্যাল।'

'একটা লোক কথা বলছে, হাঁটছে, খাচ্ছে। সে যে বেঁচে আছে তার জন্যে এটাই যথেষ্ট না? পালস দেখতে হবে, ব্লাড প্রেসার মাপতে হবে?'

হেডমাস্টার সাহেব জামবাটিভরতি গরুর মাংসের প্রায় সবটা নিজের প্লেটে ঢেলে বললেন, গ্রামে হল আপনার অশিক্ষিত মূর্খ জনগোষ্ঠীর বাস। এদের জন্যে পালস দেখা লাগে, ব্লাড প্রেসার মাপা লাগে।

'এরা কি বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে রহমান মিয়া মৃত?'

'আপনাকে বলব কী? ষোল আনা মানুষের মধ্যে দশ আনা বিশ্বাস করে রহমান মিয়া মারা গেছে। এখনো বিশ্বাস করে।'

'বলেন কী?'

হেডমাস্টার সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, শিক্ষার আলো এই জন্যেই দিকে দিকে জ্বালানো দরকার। নবীএ করিমের (সঃ) সহী হাদিস আছে, শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যাও। আছে না?

'জি আছে।'

হেডমাস্টার সাহেব চতুর্থবারের মতো তাঁর প্লেটে পোলাও নিলেন। জিন্দা লাশকে দেখে আমি যেমন অবাক হয়েছিলাম—প্রায় সুতার মতো শরীরের হেডমাস্টার সাহেবের খাওয়া দেখেও প্রায় তেমন অবাকই হচ্ছি। আমি খাওয়া শেষ করে হাত গুটিয়ে ফেলেছি দেখে হেডমাস্টার সাহেব বাটির বাকি গোশত প্লেটে ঢালতে ঢালতে বললেন, কফি বানাচ্ছে। কফি খান। তারপর কাঁচা সুপারি দিয়ে একটা পান খেয়ে শুয়ে ঘুম দেন। আকাশের যে অবস্থা আজ বোধহয় চাঁদ উঠবে না। তবে আপনেরে কথা দিলাম, চাঁদ যত রাতেই উঠুক বাঁশবনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে যাব, কফি নিয়ে যাব ফ্লাস্কে করে। আরাম করে জোছনা দেখবেন। জোছনা দেখার সময় যেন মশা ডিসটার্ব না করে এই জন্যে গ্রোব মার্কা মশার কয়েল আনিয়ে রেখেছি। সব রেডি করা আছে।

আমি বললাম, আপনি আরাম করে ঘুমান। আমার দুপুরে ঘুমিয়ে অভ্যেস নেই। আমি বরং রহমান মিয়ার সঙ্গে গল্প করি।

'খবরদার, ওই কাজটা করবেন না।'

'অসুবিধা কী? পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।'

'যত ইন্টারেস্টিংই মনে হোক, কথা বলবেন না। আমার রিকোয়েস্ট। কথা বললে সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

কী সমস্যা হেডমাস্টার সাহেব ব্যাখ্যা করলেন না। নিতান্তই নিরীহ একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে হেডমাস্টার সাহেবের এত অনাগ্রহের কারণ ধরতে পারলাম না। আমি এক কাপে দেড় পোয়া চিনি দিয়ে বানানো কফির পেয়ালা হাতে রহমান মিয়ার সঙ্গে গল্প করতে গেলাম।

আগ্রহী দর্শকরা এখনো আছে। তারা আগে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। মনে হচ্ছে তারা আরো কিছু 'মজা'র প্রত্যাশী। আমি রহমান মিয়ার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে চাচ্ছিলাম তা বোধহয় সম্ভব হবে না। আমি চেয়ারে বসতে বসতে কী বলব না-বলব গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। আমার মনে হচ্ছে রহমান মিয়ার মনের ভেতরে কোনো বিচিত্র কারণে একটা ভুল ধারণা ঢুকে গেছে। ভুল ধারণাটা দূর করারও কেউ চেষ্টা করছে না। সবাই মজা পাচ্ছে। ভুল ধারণা দূর করা মানেই তো 'মজা'র সমাপ্তি।

'রহমান মিয়া।'

'জি।'

'আপনি যে মারা গেছেন এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'জি।'

'কখনো সন্দেহ হয় না?'

'না।'

'এত নিশ্চিত হলেন কীভাবে?'

রহমান মিয়া প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাঁ হাত উঁচু করে আমাকে দেখাল। আমি দেখলাম, হাতের তালুর নিচে চামড়া কালো হয়ে কুঁচকে আছে। কোঁচকানো কালো চামড়া মৃত্যুর প্রমাণ হতে পারে না। আমি কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছি—দর্শকদের একজন বলল, 'কুপির উপরে হাত ধরছিল। চামড়া পুইড়া গেছে। কোনো দুঃখু পায় নাই।'

চামড়া পুড়ছে কিন্তু ব্যথা পাচ্ছে না, নিশ্চয়ই এর কোনো ব্যাখ্যা আছে। যে স্নায়ু ব্যথাবোধ মস্তিষ্কে নিয়ে যায় সেই স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেছে বা এই জাতীয় কিছু হয়েছে। ডাক্তাররা ভালো বলতে পারবেন। কুষ্ঠরোগে এ রকম হয় বলে শুনেছি। কুষ্ঠরোগীর ত্বকের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়।

আমি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনাদের কি ধারণা রহমান মিয়া মৃত?

বৃদ্ধ একজন দার্শনিকদের মতো বলল, আল্লাহ্‌র আলমে বহুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সবই আল্লাহ্‌পাকের কুদরত!

'অর্থাৎ আপনি বিশ্বাস করছেন সে মৃত?'

'আমি বিশ্বাসও করি না, আবার ধরেন অবিশ্বাসও করি না।'

'সেটা কেমন কথা?'

'লক্ষণ বিচারে মাঝে মাঝে পাই জিন্দা, মাঝে মাঝে পাই মুর্দা। মুর্দারে কোনো সময় মশায় কামড়ায় না। রহমান মিয়ারেও মশায় ধরে না।'

'মেয়ে মশা রক্ত খায় তার পেটের ডিমের পুষ্টির জন্যে। রহমান মিয়ার রক্তে হয়তো কোনো সমস্যা আছে যে জন্যে মশারা তার রক্ত খাচ্ছে না।'

'জি হইতে পারে।'

'আমার ধারণা রহমান মিয়ার খুব ভালো চিকিৎসা হওয়া দরকার। তার রোগটা মনে। এই রোগ সারাতে হবে।'

'গরিব মানুষ। ভাত জোটে না আবার চিকিৎসা!'

আমি রহমান মিয়ার দিকে তাকালাম। প্রথমে যেভাবে বসে ছিল এখনো ঠিক সেইভাবেই বসে আছে।

হঠাৎ মনে হল রহমান মিয়ার মধ্যে খুবই অস্বাভাবিক কিছু আছে। যা বারবার আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। অস্বাভাবিকতাটা কি বসে থাকার ভঙ্গির ভেতর? নাকি তাকানোর ভেতর? সে কারো দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। সে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

'রহমান মিয়া!'

'জি।'

'তাকান তো আমার দিকে।'

রহমান মিয়া তাকাল। আমি বললাম, আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন। না বলা পর্যন্ত চোখ নামাবেন না।

'জি আচ্ছা।'

রহমান মিয়া তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্বাভাবিকতাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি চোখের পাতা ফেলছেন না। একবারও না। নিশ্চয়ই এরও কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আমার বুকে ধক করে ধাক্কার মতো লাগল। ব্যাপারটা কী? আমার মনে হচ্ছে আমি এই মানুষটাকে চোখের ভেতর দিয়ে অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি। যা দেখছি তার সঙ্গে আমার চেনা-জানা পৃথিবীর কোনো মিল নেই। আমি নিশ্চিত যে ভয় পেয়েছি বলেই এ রকম মনে হচ্ছে।

'রহমান মিয়া!'

'জি।'

'আপনি মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকান না কেন? সব সময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন!'

রহমান মিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাই।

তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কেন তিনি মানুষের চোখের দিকে তাকান না তা তিনি জানেন, কিন্তু বলতে চাচ্ছেন না।

রাতে আমার ঘুম হল না। রহমান মিয়ার ব্যাপারটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তাড়াবার চেষ্টা করেও পারছি না। নানান উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসছে। জীবিতদের মাঝখানে মৃত মানুষরা ঘুরছে এ ধরনের গল্পগাথা পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত। জম্বিদের নিয়ে রীতিমতো গবেষণামূলক গ্রন্থ আছে। কবর দেওয়ার পর মৃত মানুষ জীবিত হয়ে ফিরে আসে। পরিচিতজনদের সঙ্গে বাস করতে আসে। এরা না মৃত না জীবিত। এরা 'জম্বি'। ড্রাকুলাদের গল্প তো সবারই জানা। জম্বিদের মতো ড্রাকুলারাও না মৃত না জীবিত। আমাদের রহমান মিয়া এ রকম কেউ না তো?

আচ্ছা এমন কি হতে পারে রহমান মিয়ার শরীর থেকে আত্মা চলে গেছে? তা হলে আত্মা ব্যাপারটা কী?

শেষরাতের দিকে ঘুমাতে গেলাম এবং খুব সঙ্গত কারণেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলাম—দেখলাম শবযাত্রার দৃশ্য। কবরখানার দিকে যাচ্ছি। আমাদের আগে আগে খাটিয়া যাচ্ছে। তবে খাটিয়াতে কোনো শবদেহ নেই। শূন্য খাটিয়া। শবদেহ আমাদের সঙ্গেই হেঁটে হেঁটে কবরখানার দিকে যাচ্ছে।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। হেডমাস্টার সাহেব ডেকে তুললেন। নান্দাইল রোড স্টেশন থেকে বারটার সময় ট্রেন যাবে ঢাকার দিকে। এখন উঠে রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারব না। নাশতা রেডি আছে। রিকশাও রেডি। নাশতা খেয়েই রিকশায় উঠতে হবে। হাতে একেবারেই সময় নেই।

অতি দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে নাশতা নিয়ে বসলাম। হেডমাস্টার সাহেব গলা নিচু করে বললেন, ওই হারামজাদা সকাল থেকে এসে বসে আছে। তার সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড। হারামজাদা বাড়ি চিনে ফেলেছে। এখন রোজ আসবে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কার কথা বলছেন?

'রহমান মিয়া।'

'কী চায়?'

'আপনাকে কী নাকি বলবে? কিচ্ছু বলার দরকার নাই।'

রহমান মিয়ার ওপর হেডমাস্টার সাহেবের তীব্র রাগের কারণ আগেও ধরতে পারি নি। এখনো ধরতে পারলাম না।

নান্দাইল রোড স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছি। কাদাভরতি রাস্তা। অনেক কষ্টে রিকশা টেনে টেনে নেয়া হচ্ছে। রিকশা ধরে ধরে এগুচ্ছে রহমান মিয়া। আমি বললাম, কিছু বলবেন রহমান মিয়া!

'জি।'

'বলুন শুনি।'

'কথাটা এখন ইয়াদ আসতেছে না।'

'মনে পড়ছে না?'

'জে না।'

'খুব জরুরি কথা?'

'জি।'

'আপনার নিজের বিষয়ে কিছু কথা?'

'জি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, মনে করার চেষ্টা করুন। আরেকটা কথা শুনুন—ঢাকায় গিয়েই আমি আপনার বিষয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব। সম্ভব হলে আপনাকে ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করব। ডাক্তারদের সঙ্গে আগে কথা না বলে আপনাকে নিতে চাচ্ছি না।'

'জি আচ্ছা।'

'আমাকে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলেন সেগুলো কি মনে পড়েছে?'

'জে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। মনে করার চেষ্টা করুন।'

নান্দাইল রোড স্টেশনে অপেক্ষা করছি। খবর এসেছে ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। হেডমাস্টার সাহেব আমার সঙ্গে আছেন। ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে তারপর যাবেন। হেডমাস্টার সাহেব রহমান মিয়াকে আমার ধারেকাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। ছাতি হাতে তাকে মারতে পর্যন্ত গেলেন। আমি বললাম, হেডমাস্টার সাহেব আপনি লোকটাকে সহ্যই করতে পারছেন না কেন, বলুন তো?

হেডমাস্টার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, আরে একটা মরা মানুষের সাথে কী কথা?

'মরা মানুষ মানে? কী বলছেন আপনি?'

হেডমাস্টার সাহেব থু করে থুতু ফেলে বললেন, মরা না তো কী! ভালো করে তাকায়ে দেখেন, হারামজাদার মাথার উপরে শকুন উড়তেছে। যেখানে যায় শকুন চলে আসে। দেখেন, নিজের চোখে দেখেন।

আমি দেখলাম রহমান মিয়া রেন্টি গাছের নিচে বেঞ্চিতে বসে আছেন। হাতে বাদামের ঠোঙা। বাদাম খাচ্ছেন। গাছের ডালে কয়েকটা শকুন। দুটা শকুন রেললাইনের কাছে। এরা রহমান মিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিশ্চয়ই এরও কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা জানি না বলে অস্বাভাবিক লাগছে। আমি বললাম, রহমান মিয়ার বাড়িতেও কি শকুন আসে?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন—শকুন আসে, শিয়াল আসে, কুকুর আসে। তার বাড়ির সবাই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। সে এখন থাকে নিজের মতো। কেউ তারে জায়গা দেয় না।

'তাই নাকি?'

'শকুন দেশ থেকে উঠে গিয়েছিল। এই হারামজাদা কোত্থেকে নিয়ে এসেছে। গ্রাম ভরতি হয়ে গেছে শকুনে।'

'বলেন কী?'

'গতকালকে আপনি তার সাথে কথা বললেন। সন্ধ্যার সময় দেখি তিনটা শকুন ওড়াউড়ি করছে। শকুন আসা খুবই অলক্ষণ। এই জন্যেই হারামজাদারে দূরে দূরে রাখি।'

ট্রেন এসে পড়েছে, আমি ট্রেনে উঠলাম। আমাকে ট্রেনে উঠতে দেখে রহমান মিয়া জায়গা ছেড়ে উঠে এলেন। হেডমাস্টার সাহেব আবারো ছাতা নিয়ে তাকে মারতে যেতে চাচ্ছেন বলে মনে হল। আমি হেডমাস্টার সাহেবকে হাতে ধরে থামালাম।

রহমান মিয়া জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, কথাটা মনে পড়েছে?

রহমান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, বলুন কথাটা কী শুনি।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। জানালা ধরে ধরে রহমান মিয়া এগুচ্ছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কথাটা কেউ বুঝব না, আপনে বুঝবেন।

'বলে ফেলুন?'

'এখন আবার ইয়াদ হইতেছে না।'

রহমান মিয়া হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রেন তাকে ছেড়ে চলে আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, দুটা শকুন হেঁটে হেঁটে এগুচ্ছে তার দিকে। শকুনরা যে অবিকল মানুষের মতো হাঁটে এই তথ্য আমার জানা ছিল না। জগতের কত কিছুই তো মানুষ জানে না।